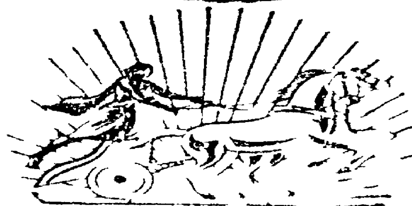
নবজন্ম

আশাপূর্ণা দেবী



ইস্টলাইট বুক হাউস

প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা ১৩৬১

প্রকাশক :—

শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী

ইষ্টলাইট বুক হাউস

২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড,

কলিকাতা—১

মুদ্রক :—

শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী

লয়াল আর্ট প্রেস, লিঃ

কলিকাতা—১

প্রচ্ছদ ভূষণ :—সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য :—দুই টাকা আট আনা।

নবজন্ম

এই লেখিকার অন্যান্য উপন্যাস

প্রেম ও প্রয়োজন

অনির্ব্বাণ

মিত্তির বাড়ী

দুর্ণিবার

বলয় গ্রাস

যোগ বিয়োগ

অগ্নি পরীক্ষা

কল্যাণী

নির্জ্জন পৃথিবী (যন্ত্রস্থ)

মেলা বসেছে 'জয়চণ্ডীতলা'র মাঠে।

ক'দিন থেকেই বসেছে। গ্রামের সীমান্ত ছাড়িয়ে মা জয়চণ্ডীর মন্দির, সেই মন্দির সংলগ্ন বিশাল মাঠে এই 'চণ্ডীর মেলা' বসে বছর বছর। এ মাঠ দেবোত্তর সম্পত্তি, মেলার দেয় খাজনাপত্র জমা হয় মা জয়চণ্ডীর কোষাগারে।

গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে তবু মেলাতলার ডুগডুগির অবিশ্রান্ত 'ডুগডুগ' আওযাজ গ্রামবাসীকে মেলার উপস্থিতি সম্বন্ধে অহরহ সচেতন করে রেখেছে। 'ঢাক পিটিয়ে' খবর রটনা করবার প্রথাটা বোধ করি পর্য্যবসিত হযেছে এই ডুগডুগির বাদ্যিতে।

বাস্থলডাঙ্গা থেকে মেলাতলায় যেতে হাটিতে বড় কম হয় না, তবু বেপরোয়া বালক-বালিকার দল দিনের মধ্যে বার চারেক আনাগোনা করছে। যদিচ নাওয়া খাওযা তারা ভুলেছে এবং সারা দিনরাত্রি মেলাতলায় পড়ে থাক্‌তে পেলেই ভাল হয় তাদের, কিন্তু রক্তচক্ষু অভিভাবকদের কথা স্মরণ করে নিতান্ত এক আধবার যখন না ফিরলে নয় তখন এসে বাড়ীর পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে, এদিক ওদিক উঁকি মেরে।

ঢুকে পড়ে ভাত-ডালের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু উত্তম মধ্যম খাচ্ছে, "আর যাবো না পায়ে পড়ি" বলে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছে, আবার খানিক পরেই অভিভাবকদের অসতর্কতার অবসরে দিচ্ছে ছুট।

চড় চাপড় ঠেঙানি বকুনি এ সব ত বারমাস আছে বারমাস থাকবে, চণ্ডীর মেলা ত বারমাস থাকবে না। প্রত্যেক বছরই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, শুধু দু'পাচ বছর আগে যারা ওই একই পাপে পাপী ছিল, তারা এখন

মুরুব্বিয়ানা চালে ছোটদের শাসন করে এবং তাদের সৃষ্টিছাড়া দুঃসাহস দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে।

অবিশ্যি নিজেরাও কি যাচ্ছে না তারা? যাচ্ছে বৈ কি, কিন্তু সে তো কাজে পড়ে। ধর—সারা বছর যে সব জিনিষের জন্যে অসুবিধে ভোগ হয় সেগুলো কিনতে হবে না? জুতো জোড়াটা ছিঁড়ে এসেছে, কিনি না কিনি দু'পাঁচ জোড়া জুতোর দর করে দেখতে দোষ কি? ছাতা একটা তো এবছরে না কিনলেই নয়। এদিকে জামা কাপড় মোজা গেঞ্জি থেকে সুরু করে ঝিনুকের বোতাম, প্লাষ্টিকের চিরুণী, সাইকেলের ল্যাম্প, টর্চ্চলাইট কোন্ জিনিষটার দরকার নেই? আর কোন্ জিনিসটা বা মেলাতলায় নেই? কাজেই না গেলে চলবে কেন! তাই বলে ছেলে-পুলেরা চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকবে ওখানে?

অবিশ্যি মহিলাদের কথা স্বতন্ত্র। মেলার ক'দিন তাঁদের ব্রজনারীর অবস্থা ঘটে। দেহটা সংসারে আবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু মন গিয়ে পড়ে থাকে মেলার মাঠে।

'মেলা' মানে যে 'প্রাণের মেলা'!

একটা মেলা যেন পৃথিবীব্যাপী বাজারের একটা ঘনীভূত কেন্দ্র। পার্থিব সমস্ত শোভা-সম্পদের বিরাট পশরা সাজিয়ে নিয়ে বসে সে নারীকুলকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানতে থাকে। একটা মেলার বাজার দেখলেই বুঝি ধারণা করা সম্ভব হয় জগতে কত কাঁচের চুড়ি আছে, আছে কত ধামা কুলো চুপড়ি মাদুর! এত জিনিষ উঠে যায়? কেনার সামর্থ্য না থাক্ শুধু দু'চোখ ভরে দেখতেই কি কম সুখ!

বস্তুর মোহ বোধ করি নারী প্রকৃতির প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। অপ্রয়োজনীয়কে 'অবশ্য প্রয়োজনীয়' ভেবে ব্যাকুল হওয়া নারী প্রকৃতিতেই সম্ভব। শৈশবকাল ওর আর ঘুচল না কোন দিন। তাই না পৃথিবী জুড়ে

অপ্রয়োজনীয় বস্তুর এমন বিরাট আয়োজন, বাহুল্য জিনিষের ভারে পৃথিবী এত ভারাক্রান্ত।

নারী যদি একবার তার চোখ থেকে শৈশবের রং মুছে ফেলে, লোভাতুর অবোধ মনকে চোখ রাঙিয়ে শাসায়, বস্তুময় পারিপার্শ্বিকের দিকে উদাসীন অবহেলায় তাকায়, তা'হলে যে জগতের সমস্ত কোটীপতি শিল্পপতিরা মাথায় হাত দিয়ে বসে প'ড়বে, তা'তে আর সন্দেহ কি ?

বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে নিজেকে "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবো। তা' মেলার বাজারে ঘুরলে সে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নিজেকে কী অপরিসীম দীন-ই না মনে হয় এখানে এলে !

এই পর্ব্বত প্রমাণ জিনিস থেকে কীই বা নিয়ে যেতে পারা যায় ! থাক দিয়ে সাজান খাগড়াই কাঁসার ঝক্‌ঝকানি থেকে চোখ ফিরিয়ে হয় তো একজোড়া 'কাঁস্‌-পিতুলে' বাটি, হয় ত একখানা হাল্‌কা ঠন্‌ঠনে বগি থালা ! বিরাট বস্ত্রসম্ভার থেকে বেছে বেছে কম দামের শাড়ীখানি নিশ্বাস ফেলে তুলে নেওয়া ! এই তো ! গ্রামের লোকের অবস্থাই বা কি !

তবুও মেলার বাজার খালি হয়ে যায়। কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধে, পিঁপড়ের সারিতে মধুর বোতল শেষ করে ! তা' না হলে কি আর ব্যাপারীরা এত খরচা করে এসে হাজির হয় ? দোকান পিছু যা "তোলা" ওঠে তা'তেই মা জয়চণ্ডীর সম্বৎসরের যত পাল-পার্ব্বণ ইত্যাদির খরচা চলে।

দোকান আসে হরেক রকমের, আসে নাগরদোলা চড়কগাছ, আসে ঝুমুর গান আর তরজার দল। আর প্রায় প্রত্যেক বছরই বিধাতার খাম-খেয়ালের কোন এক অদ্ভুত নমুনাকে নিয়েআসে অ-বাঙালী কোম্পানী। এই এদের ব্যবসা। নিয়ে আসে সাতপেয়ে গরু, পিঠে পিঠে জোড়া লাগা যমজ শিশু, হয় ত বা ছাগলের ধড়ে গাধার মুখ, হয় ত বা বাক্‌সিদ্ধ মর্কট।

এদের জন্যে মেলার একাংশে তাঁবু খাটিয়ে একটী গোপন রহস্যদুর্গ তৈরী

করা হয়, তার দরজায় উদয়াস্ত ব্যাণ্ড বাজতে থাকে এবং একজন তারস্বরে উক্ত অদ্ভুত জীবের রূপ ও গুণের ফিরিস্তি আউড়ে চলে। দর্শনী নগদ এক আনা থেকে দু' আনা।

মধুচক্রের আশে পাশে মৌমাছির দলের মত আবাল-বৃদ্ধ বনিতার দল এই রহস্যদুর্গের দরজায় ভীড় করে থাকে। দর্শনীর চারটী মাত্র পয়সাও সকলের জোটে না, তারা কেবল উঁকিঝুঁকি মেরেই কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে।

এবারেও তাঁবু পড়েছে।

এ বছরের আকর্ষণ একটী চতুর্ভুজ মানব। কাজেই এবারের জীবটি 'অদ্ভুত' না হয়ে 'অলৌকিকে'র পর্য্যায়ে পড়েছে। সোজা কথা তো নয়, চতুর্ভুজ! চতুষ্পদের সঙ্গে যার আকাশ পাতাল তফাৎ।

ক্ষীণকায় কুৎসিত দর্শন একটি বালকের পিঠের দু'খানা উঁচু হাড়ের উপর বিঘৎ খানেক লম্বা দুটি হাতের মতো, তার আগায় নাকি আঙুলেরও আভাস আছে। বালকটি কোন দেশীয় তা কেউ জানে না, আপাততঃ তা'র নামকরণ হয়েছে 'নর নারায়ণ'।

এবারে আর পয়সার অভাবের কথা ওঠে না, একবার করে নরনারায়ণ দর্শন ক'রে সকলেই অধম নরজন্ম হতে উদ্ধার হচ্ছে।

বাসুলডাঙা থেকে চণ্ডীতলায় যাবার যেটা ন্যায্য পথ, ছোট ছেলেরা প্রায়শঃই সেটা বর্জ্জন করে চলে, কারণ শুধু হাঁটা বেশী বলেই নয়, সে পথে 'রক্ত চক্ষু'র সামনে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও যথেষ্ট। আর একটি শর্টকাট আছে সে হচ্ছে—ঘোষালদের উঠোনের উপর দিয়ে। সেই পথেই ছেলেদের গতিবিধি।

ঘোষালগিন্নী নিভাননী যদিও এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, এবং যখন তখন অনধিকার প্রবেশকারী দ্রুতধাবমান বালকদলের উদ্দেশে যা শাপ শাপান্ত করেন, তা'র যথার্থ কোনো 'পাওয়ার' থাকলে ছেলেগুলো মেলা তলা পর্য্যন্ত পৌছতো কি না সন্দেহ। হয়তো বা পথেই মারা পড়তো। পরম ভাগ্য তাদের যে কলিযুগে বাক্য শক্তিহীন।

নিভাননী একাই নয়, তাঁর মেয়ে সুধামুখীও নিজ নাম-মহিমা বিস্মৃত হয়ে বিষ উদ্গারণ কম করে না। উঠোনে ওঠবার দরজা বন্ধ করে রাখে, কিন্তু ঘরেই তা'দের ঘরভেদী বিভীষণ! সে বিভীষণ আর কেউ নয়, নিভাননীর ছেলের বৌ বাসন্তী। বন্ধ্যা বাসন্তীর কাছে ছেলে পুলের ভারী প্রশ্রয়। শ্বাশুড়ী ননদ চোখের আড়াল হলেই ও টুক্ করে দরজা খুলে দেয়। আর যদি কাউকে একবার কায়দা করতে পারছে তো মেলার মাঠের খবর জেনে নিচ্ছে তন্ন তন্ন করে।

কিন্তু গাঁ শুদ্ধ্ লোক তো মেলা তলায় আনাগোনা করছে, বাসন্তীই বা পরের মুখে ঝাল খাব কেন? বাসন্তী কি-যায়না? এই···এইখানেই আসল কথা। যায় না নয়, যেতে পায না। মেলায় যাওয়ায় বাসন্তীর স্বামীর কড়া নিষেধ। নিষেধের সপক্ষে কিন্তু বিশেষ কোন যুক্তি নেই শশধরের, ও খালি ওর গালের হাড় বার করা শীর্ণ মুখখানা বাঁকিয়ে বলে—রাম কহো! ভদ্রলোকের মেয়েছেলে মেলায় যায়? যেন পাড়ার সমস্ত মহিলাকুল 'ভদ্রলোকের মেয়ে' নয়, এমন কি নিভাননী পর্য্যন্ত। কারণ নিভাননীরও ছাড়পত্র আছে।

ছাড়পত্র নেই শুধু বাসন্তীর আর সুধামুখীর। শশধরের স্ত্রীর আর ভগিনীর। সুধামুখী অবশ্য দাদার নিষেধের যথার্থ মর্য্যাদা রাখে কি না তা'তে সন্দেহ আছে বাসন্তীর, কারণ মায়ে ঝিয়ে কি যে গুজ্ গুজ্ করে ওরা, সে ওরাই জানে। আর ঠিক এই সময়েই যেন সুধামুখীর যতো পাড়া

বেড়ানোর ঘটা। বৌ মানুষ বাসন্তী পাড়া বেড়ায় না, কাজেই যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, ও শুধু তাই সন্দেহের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, এবং সুযোগ হলেই সেই অদেখা স্বর্গলোকের বর্ণনা শুনছে!

আজও যখন গোটা তিন চার ছেলে সশব্দ ফিসফিস্ স্বরে আলাপ করতে করতে উঠোন পার হচ্ছে, বাসন্তী থপ্ করে দালান থেকে-নেমে পড়ে একটা ছেলের হাত ধরে বলে ওঠে কিরে কেষ্ট আবার যাচ্ছিস না কি?

কেষ্ট হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফিক করে হেসে ফেলে চুপিচুপি বলে "চুপ চুপ কাকীমা, তোমার ওই ডাইনী বুড়ি শ্বাশুড়ীটা শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। ছাড়ো যাই।"

বাসন্তী কিন্তু ছাড়ে না, ছেলেটার হাতটা চেপে ধরে থেকেই উত্তেজিত কৌতূহলের সুরে বলে ছাড়ছি, দাঁড়া না! নর নারায়ণ দেখেছিস?

কেষ্ট যেন হঠাৎ দপ্ করে নিভে যায়, ম্লানভাবে বলে—কোথায়? আমি, গোপাল, উমাপদ, আমরা কেউই দেখিনি।

বাসন্তী তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে কেন? এতোবার যাওয়া আসা করছিস আর আসল জিনিশটাই দেখছিস না?

দেখবো কোথ্থেকে? দু'আনা করে টিকিট যে!

বাসন্তী অবাক ভাবে বলে—ওমা! কী বোকা ছেলে রে তোরা, দু' আনা পয়সা খরচের ভয়ে জলজ্যান্ত নারায়ণ দর্শন করবি না?

—দু'আনা! দু'আনা পয়সাই বা পাবো কোথা? ··· কেষ্ট একটি উচ্চাঙ্গের চাল চালে, মুখখানি যতোটা সম্ভব করুণ করে বলে— বাবা কি পয়সা দেয়? একটা পয়সা চাইলে বলে — "মেরে পিঠের ছাল তুলবো"।

— বাবা তো বলবেই, বেটাছেলে যে! প্রাণে কি মায়া মমতা আছে! কিন্তু তোর মা? ··· বাসন্তী উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে উত্তরের আশায়।

তা উত্তর ভালোই পায়। কেষ্ট একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে বলে—

মা ? হুঁঃ। মা নইলে আর পয়সা দেবে কে ? মা একেবারে রাজা কি না ! বাবা কি মাকেই দেয় নাকি ?

বাসন্তী ব্যগ্রভাবে বলে — আচ্ছা আমি তোদের পয়সা দেবো, তোরা দেখে এসে আমায় বলবি।

কেষ্ট এবং তার সঙ্গীযুগল আকর্ণহাস্যে বলে — নিয্যস বলবো, ঠিক বলবো। দাও তা হলে ?

বাসন্তী তাড়াতাড়ি আঁচল থেকে একটা আধুলি নিয়ে দলপতি কেষ্টর হাতে দিয়ে বলে — এই আধুলিটা নে। তিনজনে দেখবি বুঝলি ? ··· গোপাল, উমাপদ, কেষ্ট তোদের টিকিট কিনে দেবে কেমন ?

কেষ্ট পরম স্নেহভরে আধুলিটি হাতের মুঠোয় চেপে ফেলে একগাল হেসে বলে ফিরে এসে বাকী দু'আনা ঘুরিয়ে দিয়ে যাবো।

বাসন্তী হেসে ফেলে। কেষ্টর মাথাটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলে — থাক থাক, খুব গোছালো ছেলে হয়েছিস, তোকে আর দু'আনা পয়সা ঘুরিয়ে দিতে হবে না, ওতে ঝাল ছোলা কিনে খাস।

বিস্ময় আনন্দ আর শ্রদ্ধার সংমিশ্রনে গঠিত একটি অপূর্ব্বদ্যুতি খেলে যায় তিনটি গ্রাম্য বালকের মুখের ছবিতে। 'ঘোষাল কাকীমা' ভালো বটে, কিন্তু এতো ভালো !

ছেলে তিনটি বোধ করি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছিলো, হঠাৎ কোনো কিছু না বলে চোঁ চা দৌড় দেয়। বলা বাহুল্য বাসন্তী এতে বিস্ময় বোধ করে না, কারণ ওদের ওই দৌড় মারার কারণটা বাসন্তীর অনুমানের বাইরে নয়। ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটেছে নিভাননীর।

নিভাননী এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মুখাকৃতি ভীষণ করে বলেন — ছোঁড়া তিনটে অমন করে দৌড় মারলো যে বৌমা ! ব্যাপারটা কি ?

বাসন্তী ব্যাপারটাকে লঘু করে তাচ্ছীল্যভরে বলে — ব্যাপার আবার

কি মা ? ছেলে পুলের হাঁটাই দৌড়। কি খেয়াল হয়েছে, ছুট মেরেছে।

— শাক দিয়ে মাছ ঢেকে জগতকে বোঝাওগে বৌমা, নিভা ঘোষালনীকে বোঝাতে এসো না। ··· নিভাননী জলদগম্ভীর স্বরে মনের সন্দেহ উচ্চারণ করেন — নিশ্চয় কিছু একটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। দেখলাম কেষ্টা মুঠোর মধ্যে কি যেন চেপে ধরে ছুটলো।

বাসন্তী যেন নিতান্ত সরলতায় বলে - এই দেখুন কাণ্ড ! নিয়ে আবার কি যাবে ? আমি একটা মানুষ জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে ! নিলেই হলো ?

তুমি ? নিভাননী মুখ ঘুরিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন — তোমার ব্যাখ্যানা আর তুমি নিজে মুখে কোরো না বৌমা ! সেই যে বলে না 'চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা'। তোমার সেই তাই।

কথার মাঝখানে সুধামুখী ঘাট থেকে এসে দাঁড়ালো। কাঁকে কলসী, পরণে ভিজে কাপড়। দাওয়ার ওপর ঘড়াটাকে দুম্ করে নামিয়ে রেখে ভিজে আঁচলটা নিঙড়ে পায়ের কাদা ধুতে ধুতে সুধামুখী উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে — মা শুনেছো নর নারায়ণ ভূত ভবিষ্যত সব বলে দিচ্ছেন !

— অ্যাঁ ! নিভাননী সচমকে বলেন — কে বললে ?

— কে না বলছে ! সুধামুখী মায়ের ধরণে মুখটা ঘুরিয়ে বলে — গাঁ শুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেছে একেবারে। শুধু আমাদের বাড়ীতে কি বা রাত্রি কি বা দিন ! চন্দ্র সুয্যি দুই সমান।

চমক লাগে বাসন্তীরও।

'শুধু গৌর নয় গৌরহরি' !

শুধু নর নারায়ণ নয়, আবার ভূত ভবিষ্যত ! আর সেই অপূর্ব্ব মহিমার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকবে শুধু হতভাগিনী বাসন্তী ! শাশুড়ী ননদের সামনে সহজে মান খোয়ায় না ও, তবু এখন আর স্থির থাকতে পারে না। প্রশ্ন করে বসে—কোথায় শুনলো ঠাকুর ঝি ? কাকে কি কি বলেছেন ?

—যে যাচ্ছে তাকেই বলছেন। একটি সিকি আর একটা সুপুরীর ওয়াস্তা। সুপুরীটি হাতে করে পূর্ব্ব মুখী দাঁড়িয়ে তিনটি প্রশ্ন করবে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর!

বাসন্তী ব্যগ্রভাবে বলে—তিনটীর বেশী কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না ঠাকুরঝি?

সুধামুখী আন্‌লা থেকে শুক্‌নো শাড়ীখানা পেড়ে নিতে নিতে বলে—যাবে না কেন? পয়সা থাকে একশোটা কথা শুধোও। একটা সিকিতে তিনটী কথা। নারায়ণ তো আর খোকা নয় যে, ভুলিয়ে ভালিয়ে এক টিকিটে দশ কথা আদায় করে নেবে? – আমি কিন্তু এই বলে রাখছি মা, আজ আর আমি দাদার মানা শুনছি না, আজ আমি যাবই। এতে দাদা গালই দিক আর মারই দিক। দাও দিকিন চারগণ্ডা পয়সা।

নিভাননী ব্যাজার মুখে বলেন—পয়সা বললেই পয়সা? কোথা থেকে আসবে বাছা? আমার কাছে কিছু নেই, শশধর বাড়ী আসুক—

সুধামুখী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে — দাদা এলে, তার কাছ থেকে চেয়ে তবে তুমি আমাকে চার গণ্ডা পয়সা দেবে মা? এই আষাঢ়ে গল্প আমদানী করছো এখন? চার গণ্ডা পয়সা তোমার কাছে নেই?

—থাকবে কোথা থেকে বাছা? চব্বিশ ঘণ্টাই তো খরচ! তোমাদের বায়না মেটাতে মেটাতেই ফতুর হয়ে গেলাম আমি। এই তো তোমার ব্যাটা বায়না করে দু'আনা পয়সা নিয়ে গেল।

কে? বাদলা? সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে বলে—দিদিমা তুমি, দু'আনা পয়সা নাতিকে দিয়েছ, কি না দিয়েছ, তাই নিয়ে আর বড়াই করো না মা। আমারও যেমন কপাল, তাই তোমাদের হাত তোলায় পড়ে আছি। অমনিষ্যি ধরে তার হাতে দিয়েছ, এখন 'পারছি না' বল্লে চল্‌বে কেন?

বাসন্তী এতক্ষণ বোধ করি 'ভূত ভবিষ্যতের' স্বপ্নে বিভোর ছিল, হঠাৎ

মাতা-কন্যার মধুরালাপে 'বর্ত্তমানে' ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে আঁচলের গিঁঠ খুলতে খুলতে বলে—এই যে নাও না ঠাকুরঝি ! রয়েছে তো—

সুধামুখী যেন বাসন্তীকে কৃপা করছে এইভাবে হাতখানা পেতে বলে—দাও ! সাধে কি আর শাস্তরে বলেছে "ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত" !

সুধামুখী পয়সা হাতে পাবার পরের মুহূর্ত্তে আর দাঁড়ায় না। চকিতের মধ্যে একবার ঘরে ঢুকে একটু প্রসাধন সেরে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চণ্ডীতলা অভিমুখে যাত্রা করে।

নিভাননী গজগজ করতে থাকেন—আমার নাকের সামনে মট করে আঁচল খুলে পয়সা ছড়ানো ! গুরুজনের একটা মান মর্য্যাদা নেই গা ! হবে না কেন, শশধর যেমন আস্কারা দিচ্ছে। গর্ভধারিণী মা গেল তলিয়ে, বো'র আঁচলে পয়সা ! ঘোর কলি ! ঘোর কলি !

নিভাননী কলি বর্ণনায় যতোই পঞ্চমুখী হয়ে উঠুন, বাসন্তীর কানে আর কিছুই ঢোকে না। তার চিন্তাজগত আচ্ছন্ন করে থাকে শুধু চতুর্ভুজ নরনারায়ণ।

চারটি আনা পয়সার বিনিময়ে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সব কিছুই খবর পাওয়া যাবে। অতীত বর্ত্তমান জানার দরকার নেই, সে তো বাসন্তী অনেক জেনেছে, অহরহ জানছে, কৌতুহল শুধু ভবিষ্যতের প্রশ্নে।

কী সেই ভবিষ্যত ?

বাসন্তীর চোখে যা কেবল একটি নিরন্ধ্র অন্ধকারের দেওয়াল মাত্র। এই দেওয়ালটা কী কংক্রীটের গাঁথুনী নীরেট কঠিন ! কোথাও কোন বিদারণ রেখা নেই, যেখান দিয়ে কোনোদিন কোনো আলো উঁকি মারতে পারে ? ··· না'কি এ শুধু একটা ঘন কুয়াশার পর্দ্দা মাত্র ? সহসা একদিন কোন নতুন সূর্য্যোদয়ের সোনালী আলোয় কোথায় উধাও হয়ে যাবে এই অন্ধকার !

এতো ভালো করে কিছুই ভাবতে পারে না বাসন্তী। এতো পরিষ্কার চিন্তাশক্তি আসবেই বা কোথা থেকে নিতান্তই একটি অশিক্ষিতা গ্রামবধুর ? স্পষ্ট ভাবতে পারে না, শুধু বোধহীন একটি নিরুপায় ব্যাকুলতা মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে।

(ভারী হাসি খুসি স্বভাবের মেয়ে ছিল বাসন্তী বিয়ের আগে। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব কিছুর ওপরই যেন তা'র ষোলো আনা আকর্ষণ। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর একটি সজীব মেয়ে। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে সে উজ্জ্বল করে রাখতে পারে, মাতিয়ে রাখতে পারে।)

কিন্তু শ্বশুরবাড়ী বড়ো শক্ত ঠাঁই। বাসন্তীকে বাসন্তীর শ্বাশুড়ী ননদ আর স্বামী এই তিন জনে মিলে প্রায় ঢিট্ করে এনেছে বলা চলে।

মেয়েমানুষের পক্ষে কোন কোন আচরণ সঙ্গত, আর কোন কোন আচরণ অসঙ্গত, তার হাজারো ফিরিস্তি নিভাননীর মুখস্থ। উঠতে বসতে সেইগুলির সদ্ব্যবহার করে এসেছেন তিনি এযাবৎ কাল, এখনো করেন। আবার কেবল মাত্র ঈর্ষার বিষে মানুষকে কতোটা জীর্ণ করে ফেলা যায় তার উদাহরণ দেখাচ্ছে সুধামুখী। (নামমাহাত্ম্যে সে প্রায় 'পদ্মলোচনেরই' সমগোত্র।)

এ ছাড়া শশধর। লোক হিসেবে শশধর যে খুব একটা খারাপ কিছু তা নয়, স্বামী হিসেবেও পাষণ্ড বদমাইস অত্যাচারী নিপীড়ক বা ওই রকম একটা কিছু বলা যায় না, কিন্তু একটী দোষেই বাসন্তীর জীবন বিষময় করে তুলতে সক্ষম সে। আর কিছু নয়, লোকটা স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত।

প্রেম বিহীন স্বামী তো দুঃখদায়ক, কিন্তু অতি প্রেমিক স্বামী? (যে স্বামী স্ত্রীটিকে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে একান্তভাবে নিজের করে রাখতে চায়? হয় তো বা এই উৎকট সুখের চাইতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ কমই আছে।)

কিন্তু দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

নিভাননী তাঁর আজন্মসঞ্চিত কুশিক্ষা আর অশিক্ষার প্রতিক্রিয়ায় এইটেই ভাবতে অভ্যস্ত—ছেলের বৌকে টাইট্ করে রাখাটাই শ্বাশুড়ী জাতির কর্ত্তব্য। আবার সে ছেলে যদি একটি মাত্র ছেলে হয়, তা'হলে মাতৃ অভিমান প্রসূত ঈর্ষাটাও যে সোলো আনার ওপর আঠোরো আনা হ'তে বাধ্য।

আর সুধামুখীর কথা বলতে গেলে তার প্রাণেই বা উদারতার হাওয়া বইবে কোন আকাশ থেকে? পৃথিবীকে সোনার চোখে দেখবে, এমন চোখ সে পেলো কোথায়! যে মেয়েকে নিরুপায় হয়ে স্বামী পুত্র সমেত বাপের বাড়ী পড়ে থাকতে হয়, পৃথিবী তার কাছে তিক্ত স্বাদের ভাণ্ড মাত্র। তাই যা কিছু দেখে তা'তেই তার চোখে জ্বালা ধরে।

এ ছাড়া বলতে পারা যায় শশধরের কথা।

খুঁজলে শশধরের মনস্তত্ত্বেরও একটা হদিস পাওয়া যায় বৈকি। বাসন্তীকে বিয়ে সে করেছে বটে এবং বিয়ে হয়ে ইস্তক তার সংসারে বাসন্তী দাসীবৃত্তি করছে বল্‌লেও খুব মিথ্যে বলা হয় না এটাও ঠিক, কিন্তু শশধরের মনের মধ্যে কোথায় যেন রয়ে গেছে নিজের সম্বন্ধে একটা অযোগ্যতা বোধ! তাই না বাসন্তীকে এমন করে আগলে রাখতে চায় সে, যাতে সেই যোগ্যতা অযোগ্যতা বোধটা বাসন্তীর ভিতরেও এসে না পড়ে।

আপন আপন ক্ষেত্রে তিনজনেই সাধারণ স্বাভাবিক, বরং অস্বাভাবিক বল্‌তে পারা যায় বাসন্তীকেই। কারণ বিয়ের পর থেকে এই আট বছর ধরে যে নাগপাশে বন্দী হয়ে আছে সে, তাতে তার জীবনীশক্তি লুপ্ত হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তা যায়নি। এখনো তার হাসিতে উচ্ছলতা, চোখের তারায় চঞ্চলতা।

আর একটী ব্যক্তি এ সংসারে আছে সে হচ্ছে সুধামুখীর স্বামী গৌরাঙ্গ।

'বাউণ্ডুলে' শব্দটার যদি কোন প্রতীক খাড়া করার দরকার হয়, তা'হলে অনায়াসেই গৌরাঙ্গকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। লেখাপড়ার বালাই কোন কালে ছিল কি না বলা শক্ত, নিভাননী যে একমাত্র মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সে বোধ করি কেবলমাত্র ভাবী জামাতার রূপে বিগলিত হয়ে। নামটা তার সার্থক; নামকরণের বেলায় কারো পরিহাস প্রবৃত্তি জেগে ওঠেনি বলা চলে।

তবে আপাততঃ নিভাননী রূপবান জামাতাকে 'রাঙা মূলো' বলে অভিহিত করেন। অবশ্য খুব অন্যায়ও করেন না। কারণ যে ভদ্রব্যক্তি রোজগার করে না এবং না করতে পারার জন্য লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, দিনরাত সুর ভাঁজে, সুযোগ পেলেই তবলা পিটোয়, প্রচুর খায় আর প্রচুর হাসে, তাকে ও ছাড়া অন্য কি বলা যায়?

অদ্ভুত লোক এই গৌরাঙ্গ।

যদিও ঘরজামাই হিসেবে সে এ সংসারের স্থায়ী বাসিন্দার পর্য্যায়ে পড়ে, তবু তার স্থায়িত্বটা অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন সময় ডুব দেয় কোথায় যায়, কেন যায়, তার পাত্তা পাওয়া যায় না। বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাকতে থাকতে তল্লাস পড়ে। পাড়ার সর্ব্বত্র খুঁজে আসেন নিভাননী। নিভাননীকেই খুঁজতে হয়, কারণ শশধর বলে—"ওর মরণের খবর পেলে আমি হরির লুট দেবো", কিন্তু কোথাও হদিস মেলে না। এক বস্ত্রে চলে যায়, কি যে করে সেই জানে আর ঈশ্বর জানেন।

তখন সুধামুখী কাঁদে কাটে, ভাইয়ের ওপর অভিমান করে, এমন হতভাগার হাতে ধরে দেওয়ার জন্যে মাকে গঞ্জনা দেয়, আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়।

আবার হঠাৎ একদিন হয়তো নিতান্ত অসময়ে এসে উদয় হয়, দিব্য সপ্রতিভ ভাবে এসে মুগের ডাল ভাতে দিয়ে ভাত চড়াবার ফরমাস জানায়। সুধামুখী স্বামীর জন্যে ভাতের বদলে আর যে বস্তুর ব্যবস্থা করতে চায়, সেটা

অন্ততঃ হিন্দু নারীর ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। তখন রান্নাঘরের হাল ধরে এসে বাসন্তী। এই চঞ্চল প্রকৃতি উদোমাদা বাউণ্ডুলে লোকটার প্রতি কেন যে তার একটা সস্নেহ প্রশ্রয় আছে কে জানে! হয়তো দুজনের প্রকৃতিতে কোথাও কোনখানে আছে একটুখানি মিল। বয়সে বাসন্তী গৌরাঙ্গর চাইতে কোন্ না বছর চার পাঁচের ছোট, তবু বাসন্তীর মনে হয় ও যেন একটা বড় মাপের শিশু।

সুধামুখীরও অবশ্য প্রায় তাই মনে হয়, তবে সে তার মনের কথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেনা, সচীৎকারে বলে—বুড়োখোকা! গৌরাঙ্গ রাগেনা, উলটে বৌকে আরো ক্ষ্যাপায়। বৌকে ক্ষ্যাপায়, শালা আর শাশুড়ী পিছন ফিরলেই স্বচ্ছন্দে 'ক্যারিকেচর' করে, ভাতের খোঁটা দিলে ভাত চেয়ে নিয়ে বেশী করে খায়।

তারও বাসন্তীর প্রতি এমন একটা সশ্রদ্ধ প্রীতি আছে যা সহজেই চোখে পড়ে। এবং সেটা নিভাননী এবং সুধামুখীকে উত্তপ্ত করে তোলার সাহায্যে লাগে।

সুধামুখী পয়সা নিয়ে চলে যাওয়ার পরই উঠানের বেড়ার দরজা ঠেলে আবির্ভাব ঘটলো গৌরাঙ্গর। গায়ে একটা হাফ্সার্ট কিন্তু ধুতীর কোঁচাটি দিব্য লম্বা। কাঁধের উপর একটা ভাঙ্গা ঝরঝরে ছোট্ট বক্স হারমোনিয়ম, ডান হাতে একটা দড়িবাঁধা মাছ।

দশদিন অনুপস্থিতির পর এই নাটকীয় আবির্ভাব গৌরাঙ্গর।

—ওমা ঠাকুরজামাই যে! মাছটা ধরলে নাকি? এতোদিনে আসা হলো মশাইয়ের? দশ দশটা দিন ছিলে কোথায় ঠাকুরজামাই?—কলহাস্যে সম্বর্ধনা করে ওঠে বাসন্তী।

—ছিলে কোথায় !

নিভাননী কোমরে হাত দিয়ে বাগিয়ে এসে দাঁড়ান—বৌয়ের সুর নকল করে বিকৃত মুখে বলেন—ছিলে কোথায় ! বড্ডো যেন নতুন ঘটনা ! যখন তখন উধাও হওয়া ঠাকুরজামাইয়ের এই নতুন কেমন ? শালার সংসারে বেওয়ারিশ ভাত আছে, আর শালাজের আস্কারা আছে, ভাবনাটা কি ? বলি এই অবেলায় মাছ হাতে ঢুকতে তোমার লজ্জা হলোনা বাছা ?

গৌরাঙ্গ ততক্ষণে হাত থেকে মাছটা নামিয়েছে, আর কাঁধ থেকে নামিয়েছে হারমোনিয়ম। রোয়াকের ধারে রাখা ঘড়া থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে কোঁচার খুঁটে মুছতে মুছতে অম্লান বদনে বলে—লজ্জা ? কই নাতো !

উত্তর শুনে বাসন্তী হেসে ফেলে, কিন্তু নিভাননীর মুখ আরো ভীষণাকৃতি হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন — তা বলবে বৈকি, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছো। কিন্তু গেরস্থর তেল এতো সস্তা নয় বাছা যে, মাছ দেখে আহ্লাদে গলে যাবে। ও মাছ নিয়ে যাও, যাকে প্রাণ চায় বিলিয়ে দিয়ে এসো, এবাড়ীতে দরকার নেই।

গৌরাঙ্গ আর একবার মাছটা তুলে প্রায় শাশুড়ীর নাকের কাছ বরাবর দুলিয়ে বলে — কি যে বলেন, এমন ফার্ষ্টক্লাশ মাছটা বিলিয়ে দেবো ! ··· বার করুন বৌদি, আঁশবঁটি বার করুন।

বাসন্তী কৌতুকহাস্যে চাপাগলায় বলে—আঁশবঁটি দিয়ে তোমার নাক-কাটা হবে।

ব'লে বোধকরি বঁটি আনতেই উঠোনে নামে। চাপা গলার কথাটা নিভাননীর কান এড়ায়, কিন্তু পরিহাসউছল ভঙ্গীটি চোখ এড়ায় না। বীর বিক্রমে এগিয়ে এসে তর্জ্জনি তুলে বলেন—খবরদার বৌমা, বলে দিচ্ছি তোমায়, ও মাছে তুমি হাত দিতে পাবে না। বিলিয়ে না দেয় শ্যাল কুকুরে

থাক। দশদিন পরে বাড়ী ঢুকলেন মাছের ঘুষ নিয়ে। বুঝি না কিছু আমি? আমার দিব্যি বৌমা, মাছ তুমি কুটবে না—রাঁধবে না।

বাসন্তী ক্ষুব্ধ স্বরে বলে—দিব্যি দিয়ে বসলেন? রাগলে আপনার জ্ঞান থাকে না মা। এয়োস্ত্রী মানুষের বাড়ীতে মাছকে হেনস্থা করতে আছে?

মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে বাসন্তী।

সুধামুখী আর বাসন্তী দুটি এয়ো সংসারে, কার অলক্ষণ করবেন নিভাননী? জামাইয়ের ওপর রুচিছেদ্দা নেই বটে কিন্তু তার দৌলতেই যে নিজের মেয়ের খাওয়া পরা! এদিকে চক্ষুশূল বৌটার দপ্‌দপানি একটু কমলে চোখ জুড়োতো, কিন্তু সেখানে প্রশ্ন শশধরের। অগত্যাই ভিতরে একটু নরম হয়ে পড়েন, কিন্তু মুখে স্বীকার করতে রাজী হন না, বেজার মুখে বলেন জানোই তো বাছা, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু দিব্যি যখন দিয়েছি, তখন চন্দ্র সূর্যি এলেও রদ হবে না। তবে যদি শাশুড়ীকে অগ্যেরাহ্যি করে দিব্যি ভাঙো বলবার কিছু নেই। তারা ব্রহ্মময়ী! মাগো জয়চণ্ডী কবে আমাকে নিবি মা!

বৈরাগ্যের চরম অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে নিভাননী রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন।

গৌরাঙ্গ একটা মুখভঙ্গী করে কোঁচার খুঁটটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বলে—নিজের ভোগে লাগবেনা কি না, তাই মাজননীর আমার মাছে অছেদ্দা। কুছ পরোয়া নেই, আমিই বেটার সদগতি করে দিচ্ছি, দিব্যি দিয়েছে আপনাকে, আমাকে তো লাগেনি। দিন দিকিন অস্তর খানা, এমনি বাগিয়ে কুটবো যে আপনি চমকে যাবেন।

—থাক ঠাকুরজামাই তোমাকে আর লোক হাসাতে হবে না। ঠাকুরঝি এসে ওর গতি করবে। এমনিতেই তো দণ্ডে দণ্ডে মানুষকে চম্‌কে দিচ্ছো, আর কাজ নেই।

—চমকে দিচ্ছি নাকি, কিসে বলুন তো ?

গৌরাঙ্গ জুৎ করে রোয়াকের ধারে বসে কোঁচার কাপড় দিয়ে হারমোনিয়মটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—চমকে দিচ্ছি কিসে ?

—কিসে নয় ? ...বাসন্তী সহাস্যে বলে—সেদিন ভাত নিয়ে বসে থেকে থেকে রাত দশটা বেজে গেলো, ঠাকুরঝিতে আমাতে ঘরবার করে অস্থির, ব্যস মানুষ একেবারে উধাও। আবার এই দশদিন পরে বিনা নোটিশে এক ভাঙ্গা বাজনা ঘাড়ে নিয়ে হাজির।

—ভাঙা মানে ? গৌরাঙ্গ সচকিত হয়ে ওঠে—বলেন কি বৌদি ? এই বাজনাটার জন্যেই আজ দশদিন হন্যে হয়ে বেড়িয়েছি। এক ব্যাটা দেবে বলে ঝুলিয়ে রেখে নাহক ক'দিন ভুগিয়ে মারলো। সহজে দিতে চায় ? শেষ পর্য্যন্ত রফার থেকে দু'টাকা বেশী দিয়ে তবে বাগাতে পারি। দেখতে ভাঙ্গা কিন্তু জিনিষটা বনেদী, বুঝলেন বৌদি ! শুনবেন একটু ? এমন মিঠে আওয়াজ যে কান জুড়িয়ে যাবে। বসুন, জুৎ করে শুনুন।

রীডের ওপর আলতোভাবে হাত বুলোয় গৌরাঙ্গ। আর গুন গুন করে গায — কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই মুই, আমি তোমার প্রেমের কি বা জানি।

বাসন্তী কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গ'ণে। শ্বাশুড়ী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন, ননদ অনুপস্থিত, আর শশধরের ফেরার সময় হয়ে এলো। জুৎ করে বসে ননদাইয়ের বাজনা শোনবার উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণই বটে ! কিন্তু এ লোকটার মগজে সে কথা ঢোকাবে কে ? অথচ একে রূঢ়ভাবে সে কথা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেও মায়া লাগে। তাই এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দিতে হেসে উঠে বলে—শোনো কথা ! এখন বলে ছিষ্টির কাজ পড়ে, এখন বসবো গান শুনতে ?

—ছিষ্টির কাজ ! গৌরাঙ্গ অম্লান বদনে বলে ওঠে—ছিষ্টির কাজ না

গুষ্টীর পিণ্ডি। আপনাদের কাজের মহিমা আর দেখাবেননা বৌদি, কাজ মানে তো ভাত সেদ্ধ?

বাসন্তী রাগ করেনা, রাগের ভান দেখায়। ভারী গলায় বলে—তা সেই টাই ফেলনা নাকি? মেয়ে মানুষের কাজ মেয়েমানুষে করবে এর মধ্যে লজ্জার কি আছে? লজ্জা বরং তোমারই হওয়া উচিত ঠাকুরজামাই! কাজ নেই কর্ম্ম নেই—

বাসন্তীর মুখ ফিরিয়ে হাসিটা চোখে পড়েনা গোরাঙ্গর, ও চটে ওঠে। চড়াগলায় বলে—এই হয়েছে! শ্বাশুড়ী ননদের সঙ্গে মিশে মিশে তাদের গুণ ধরেছে। 'কাজ নেই, কর্ম্ম নেই'! ওনার কর্ত্তার মতো সেরেস্তার খাতায় পেন্ কলম ঘসতে না পারলেই আর কাজ হলো না। জগতে গান আছে, বাজনা আছে, সুর আছে, তাই জগতটা এখনও টিঁকে আছে—বুঝলেন বৌদি, তা নইলে—যদি শুধু সেরেস্তার খাতা থাকতো আর শশধরদা টাইপের লোক থাকতো, তাহলে এই পৃথিবীখানাই মনের ঘেন্নায় গঙ্গায় ঝাঁপ্ দিয়ে মরতো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়মে সুরের ঝঙ্কার তোলে গোরাঙ্গ।

বাসন্তীর ইচ্ছা হয় একটা উচিত উত্তর দিতে, কিন্তু বেলা যতোই বাড়ছে ততোই ওর বুক টিপ্ টিপ্ করছে। শশধর এলো বলে। আর সকাল থেকে খেটে খুটে এ অবেলায় তেতে পুড়ে এসে যদি বাড়ী ঢুকেই চোখে পড়ে নির্জ্জন বাড়ীতে বাসন্তী আর গোরাঙ্গর কৌতুকালাপ, তাহলে কি যে হবে বলা শক্ত। অতএব একটা ছুতো করে ঘরে ঢুকে পড়বার জন্যে বলে —তা দিলে তো বাঁচা যেতো, আপদ চুকতো।···কিন্তু এই মাটি করেছে, রান্নাঘরে বোধহয় ছেকল দিইনি, এক্ষুনি বেড়াল ঢুকে —

প্রস্থানোদ্যত বাসন্তীর স্খলিত আঁচলটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে গৌরাঙ্গ হেসে উঠে বলে– রান্নাঘরে বেড়াল ঢোকবার কোন উপায় নেই বৌদি,

সেদিকে আমাদের শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বেরোবার সময় ছেকল তুলে দিয়ে গেলেন যে। নিশ্চিন্দি হয়ে বসতে পারেন।

আঁচল সামলাতেই অগত্যা বাসন্তীকে ফিরে দাঁড়াতে হয়, আর এই সঙ্গেই তার ভাগ্যাকাশের কুগ্রহগুলি তারই দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়। কুটিল গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি না পড়লে আর ঠিক এই মুহূর্ত্তেই শশধর দরজায় এসে দাঁড়াবে কেন?

বাড়ীর বাইরে থেকে হারমোনিয়মের সুর কানে গিয়েছে শশধরের, আর বুঝে ফেলেছে লক্ষ্মীছাড়া গৌরাঙ্গটা এসে উদয় হয়েছে নতুন আর একটি বিরক্তিকর বস্তু নিয়ে। কণ্ঠ সঙ্গীতেই ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে ওঠে, এর ওপর আবার যন্ত্র সঙ্গীত!

মাথায় আগুন নিয়েই আসছিল শশধর, দরজার কাছাকাছি আসতেই যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তার মন বুদ্ধি চৈতন্য। বাসন্তীর আঁচলের খুঁট গৌরাঙ্গর হাতে!

না, তবু ধৈর্য্য হারাবেনা শশধর, শেষ অবধি দেখবে, তাই দরজা থেকে সরে এসে জীর্ণ পাঁচীলের একটা ভাঙ্গা অংশে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে নীরব নিস্পন্দ। বোধ করি পরীক্ষা করতে থাকে কানের আর চোখের শক্তিটা কতোখানি বাড়ানো সম্ভব।

বাসন্তী গৌরাঙ্গ কারুরই চোখে পড়েনা শশধরের এই আবির্ভাব, তাই বাসন্তী সহাস্যে বলে — নিশ্চিন্দি? সে আর এ জীবনে নয় মশাই! কর্ত্তার আবির্ভাবের সময় হয়ে এলো। এসে যদি দেখেন ঘরের বৌ ভর-দুপুরে সংসারের কাজ ফেলে জুৎ করে বসে গান শুনছে, তা হলেই হয়েছে! তাহলে — হাসতে হাসতে কথাটা শেষ করে বাসন্তী — মুখখানি এই এ্যা—ত্তো খানি!

গৌরাঙ্গ হা হা করে হেসে ওঠে—বেশ তো আপনিও এই এ্যা—ত্তো

গুলো ভাত দেবেন। ভাতই রাগের মহৌষধ জানেন তো? কী আর বলবো বৌদি, আপনি যে ভয়েই কাঁটা, নইলে আপনাকে আমি সাতদিনে এই বিদ্যেটি শিখিয়ে দিতে পারি।

—শিখিয়ে? বলো কি ঠাকুরজামাই?

—কেন আশ্চর্য্যের কি আছে? মেয়েছেলে গান গায় না? দেখগে যান না ক'লকাতায়! আপনার এমন সুন্দর গলা, গান গাইলে —

আর শোনবার ধৈর্য্য শশধরের থাকে না, ছাতাটা বগলে চেপে বীরদর্পে এগিয়ে আসে। মনে হয় মারবেই বুঝি ভগ্নিপতিকে, কিন্তু না মারে না। বাস্তব বুদ্ধি হারাবার মতো নির্বোধ সে নয়। স্ত্রীকে আগলে বেড়াতে চায় বলে যে স্ত্রীকে বদনামে জড়িয়ে পাড়ার লোকের কাছে অপদস্থ হতে চাইবে এমন নির্বোধ অন্ততঃ সে নয। ভগ্নিপতিকে ধরে ঠেঙালে আর কলঙ্কের বাকী রইলো কি? তাই বাড়ী ঢুকে ছাতাটাকে উঁচিয়ে ধরার দুরন্ত ইচ্ছা সংবরণ করে দেওয়ালের কোণে ছাতাটা দাঁড় করিয়ে রেখে ভগ্নিপতির দিকে ঘৃণা ব্যঙ্গ ক্রোধ আর তাচ্ছীল্যের সংমিশ্রনে গঠিত একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টিনক্ষেপ করে তিক্তস্বরে বলে ওঠে—কেন, আর বেশীদিন কোথাও ভাত জুটলো না বুঝি?

গৌরাঙ্গ কোঁচার কাপড়টা দিয়ে যেন অভিনিবেশ সহকারে বাজনাটা ঝাড়তে ঝাড়তে সহজ অবহেলাভরে বলে — ভাত! ভাতের আবার অভাব? ভগবান্ যেখানে যদিন মাপান!

— হুঁ! তত্ত্বকথাও শেখা হচ্ছে দেখছি যে, কিন্তু তোমাকে এই বলে রাখছি গৌরাঙ্গ, এ বাড়ীতে ও সব চলবে না!

গৌরাঙ্গ সচমকে বলে — কি সব?

— এই সব ইযাকি। ভদ্রলোকের বাড়ীর অন্দরমহলে গান বাজনার চর্চ্চাটা না করে মোদো মাতালের আড্ডা ওদের ওই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বোসোগে! যতো সব লক্ষীছাড়া কাণ্ড!

যেন রোয়াকে উঠতে গিয়ে পা লেগে গেছে এই ভাবে ইচ্ছে করেই বাজনাটার গায়ে পায়ের ধাক্কা লাগিয়ে চলে যায় শশধর, আর গৌরাঙ্গ ত্রস্তে ব্যস্তে সেটাকে সামলে নিয়ে বলে — আহাহা ঈস্ ! একটু দেখে শুনে হাঁটতে হয় দাদা ! বুঝলেন না তো কখনো এর মর্ম্ম ! কথায় বলে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস'।

শশধর ফিরে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে উত্তেজিত ভাবে বলে — কি হয়েছে ? আবার ছড়া কাটা হচ্ছে ? খুব ভাগ্যি যে ওটাকে 'শূট্' করে পগারপার করে দিইনি। কিন্তু আমার এই স্পষ্ট কথা গৌরাঙ্গ, আমার বাড়ীতে তোমার ওই সখের বাজনা রাখা চলবে না। তোমাদের অপেরা পার্টির আড্ডায় ফেলে রেখে দাও গে।

শশধর চলে যেতেই গৌরাঙ্গ অস্ফুট স্বরে বলে — দূর শালা ! অপেরা পার্টির আড্ডায় রাখবো ! রাখলে জিনিষটা আস্ত থাকবে ? কাণা কড়ির বুদ্ধি নেই, পুরুষের রাগ আছে বিলক্ষণ ! ধুত্তোর।

সযত্নে ঘরে নিযে গিয়ে ট্রাঙ্ক বাক্সের ওপর তুলে রাখে বাজনাটাকে।

গৌরাঙ্গ বোকা হ'লেও এক একটা কথা বলে মন্দ নয়। ভাতই যে রাগের মহৌষধ তা'তে আর সন্দেহ কি ! পরিপাটি আহারের শেষে মেজাজটা একটু নরম হয় শশধরের, বাসন্তী পান নিযে এসে দাঁড়াতেই বলে —লক্ষ্মী-ছাড়াটা খেয়েছে ?

বাসন্তী মাথা নাড়ে।

— তা' ওকে ভাত কটা আগে ফেলে দিলেই পারতে ? বেলা তো বড়ো কম হয়নি, আমার যে আজ আসতে একেবারে —

— আবার ভাত চাপিয়েছি।

—এই দেখো ! সাধে কি আর বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি ! দুপুরবেলা গেরস্থ বাড়ীতে হাঁড়িতে চারটি ভাত বেশী রাখতে হয়। তোমারও খাওয়া হয়নি তো ?

বাসন্তী হেসে ফেলে ভ্রূভঙ্গী করে বলে — হ্যাঁ আগে ভাগে নিজে খেয়ে দেয়ে বসেছিলাম !

বৌকে কি শশধর কম ভালোবাসে ? তা'তো নয। একান্তে যখন দেখে, বৌয়ের হাসি, কথা, দৃষ্টিভঙ্গী সবেতেই তো মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসেনা পাঁচ জনের মাঝখানে দেখতে। এই হাসি কথাই তখন শশধরের কাণে বিষ বর্ষণ করে।

এখন হাসির প্রতিদানে মুচকে হেসে বলে — ওতে আব দোষ কি হতো ? পতিভক্তি তো কতো !

—কেন, অভক্তিই বা দেখলে কিসে ?

মনের কথা বলার একটা সুযোগ পায শশধর, তাই গম্ভীর ভাবে একটা পানের খিলির তলার কোণটুকু দাঁতে কেটে ফেলে দিয়ে বাকীটা মুখের মধ্যে জব্দ করে নিয়ে বলে—নয় কেন ? আমি যা ভালোবাসি না, যা দু'চক্ষের বিষ দেখি, তাই করতেই তো তোমার যতো স্ফুর্ত্তি।

এটা কোন কথার গৌরচন্দ্রিকা বুঝতে আটকায় না বাসন্তীর, তবু অজ্ঞের ভানে কথার সুরে অভিমান মিশিয়ে বলে—তোমার যা দু'চক্ষের বিষ, তাই করে বেড়াচ্ছি আমি ? বেশ বেশ, খুব মিথ্যে বদনাম দেওযা হচ্ছে যাহোক ! ...এই যে দেশসুদ্ধ, মেয়ে 'মেলাতলা আর ঘর' করছে, ক'রছি আমি ? গিয়েছি একবারও ? এমনই পাপিষ্ঠী আমি যে, বছরান্তে মা জয়চণ্ডীকে একবার দর্শন পর্য্যন্ত করতে যেতে পাই না।

শশধর একথা গায়ে মাখে না, উড়িয়ে দিয়ে বলে—বলি, মাচণ্ডী তো আর ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছেন না ? চণ্ডীও আছেন, তুমিও আছো !

মেলার আপদটা মিটলে চুপি চুপি একদিন মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখে এসো না!

যেন সত্যই বাসন্তী কেবল মাত্র দেবী দর্শনের আকাঙ্খাতেই অধীর।

বাসন্তী উদ্দেশে একবার দেবীকে নমস্কার জানিয়ে বলে—আহা সে না হয় দেখলাম! কিন্তু নরনারায়ণ? তিনি তো আর মেলা উঠে গেলে থাকবেননা?

হা-হা করে হেসে ওঠে শশধর। হাসি থামলে বলে—হুঁঃ। নরনারায়ণ! যতো সব বুজরুকি! চতুর্ভুজ না হাতী! কী একটা কীম্ভুত চেহারার জীব এনে বসিয়ে দিয়েছে, পয়সা তোলবার ফন্দীতে গুজব তুলে দিয়েছে— 'চতুর্ভুজ নারায়ণ'! দূর দূর!

স্বামীর নাস্তিকতা বাসন্তীর পরিচিত জিনিস হ'লেও বেচারী যেন তার এহেন নাস্তিকতায় চমকে চমকে ওঠে। মনে মনে দেবতার কাছে স্বামীর অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে—দেশসুদ্ধ মেয়ে পুরুষ সবাই নির্বুদ্ধি, আর একা তুমিই যতো বুদ্ধিমান কেমন?

—আলবৎ! নিজের বুকের ওপর থাবড়া মেরে হাড় জিরজিরে শশধর বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বলে—সব বেটা বেটি একের নম্বরের বোকা। ভগবান দেখাচ্ছে! ভূত ভবিষ্যত সব বলে দিচ্ছে! যতো সব রাবিশ!

বাসন্তী ব্যঙ্গস্বরে বলে ওঠে—দেখাবেনা কেন, দেখাচ্ছে ঠিকই। জগতে নেই কি? ভূত আছে ভগবান ও আছে। আসল কথা তো তা নয়! আসল কথা, দেশসুদ্ধ লোকের পরিবার শ্যাওড়াগাছের পেত্নী, কেউ তা'দের দিকে ফিরেও তাকায় না, আর তোমার পরিবার একেবারে স্বর্গের অপ্সরী, পথে বেরোলেই দুনিয়ার লোক হাঁ করে দেখবে।

কেউ যদি বলে শশধরের রসজ্ঞান নেই, তাহলে সে ভুল বলবে। রূপসী স্ত্রীর অভিমানস্ফুরিত মুখের আবেদন তার কাছে কম নয়। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বাসন্তীর টোল খাওয়া গালটা একটু টিপে দিয়ে শশধর বলে ওঠে—এই এইটি যা বললে খাঁটি কথা। রূপসী বৌ থাকা কি কম বিপদ?

—তা' হলে ওই রামী নাপতিনীটাকে বিয়ে করলেই হতো। নির্ভয়ে পথে ছেড়ে দিতে পারতে ?

দুষ্ট হাসি খেলে যায় বাসন্তীর চোখে মুখে।

বলা বাহুল্য রামী নাপতিনী গ্রামের মধ্যে কুশ্রীতার জন্যই বিখ্যাত।

শশধর গলা খাটো করে মুচকি হেসে বলে — বৌ তো পথে ছেড়ে দেবার জিনিষ নয়, ঘরে ধরে রাখবার জিনিষ।

—ঘরে কেন, খাঁচায় ! ··এই মরেছে, ভাতটা পুড়ছে না কি ? ত্বরিত পায়ে চলে যায় বাসন্তী।

ভাত পুড়ে যাচ্ছে ! কথাটা শুনেই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সরসতা মন থেকে উপে গেলো শশধরের। স্বামীর খাওয়া হয়ে গেছে, এখনো বাসন্তীর ভাতের জন্যে ব্যস্ততা কেন, না ওই হতভাগা রাস্কেলটার জন্য। শশধর এখন পড়ে পড়ে কড়িকাঠ গুণবে, আর বাসন্তী ঘণ্টাখানেক ধরে তরিবৎ করে সোহাগের ননদাইকে গরম ভাত খাওয়াবে বসে বসে !

এতে রাগে যদি হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করে শশধরের, তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না তাকে।

মুখখানা পেঁচার মত করে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে শশধর রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। বাসন্তী তখন ঠাণ্ডাজলে হাত ডুবিয়ে নিয়ে সদ্য প্রস্তুত গরম ভাতটা চেপে চেপে পরিপাটি করে বাড়ছে। রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেলো শশধরের, তীব্রকণ্ঠে বললো—ও পিণ্ডি বাড়া হচ্চে কার ?

—দুগ্গা দুগ্গা ! বাসন্তী বলে ওঠে—মায়ে পোয়ে একরকম। রাগলে আর জ্ঞান থাকেনা। ছোট বোনের কল্যাণ অকল্যাণ দেখোনা।

— কল্যাণ ! দাঁতে দাঁত পিষে উত্তর দেয় শশধর — ছোট বোন যেদিনে মার হেঁসেলে ভর্ত্তি হবে সেদিনে আমি হরিরলুঠ দেবো।

আজীবন গ্রাম্য আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত শশধরের মুখে এই মেয়েলি কথাটা

অসম্ভব কিছু বেমানান লাগেনা। পল্লী গ্রামের অনেক পুরুষই এমন মেয়েলি গালমন্দ ব্যবহার করে। আর মেয়েরা? তারা তুচ্ছ কারণেও অপর লোককে তো দূরের কথা আপন সন্তানের উপর যে অভিশাপবাণী বর্ষণ করে, সে বাণীর কোনো শক্তি থাকলে কি হতো ঈশ্বর জানেন। হয়তো তারা কোন দিনই এসব শাপশাপান্ত গালমন্দের অর্থ তলিয়ে দেখেনি, ওপরওলাদের কাছ থেকে শুনে শুনে শৈশবাবধিই রপ্ত করে ফেলেছে। যারা শোনে তাদেরও অভ্যস্ত কান, তাই শিউরে ওঠেনা তারা।

বাসন্তীও শিউরে উঠলোনা, শুধু বিরক্ত হলো। বিরক্ত স্বরে বললো—কি বাক্যি মুখের, যেন মধু ঝরছে!

শশধর চৌকাঠে পা ঠুকে গায়ের ঝাল খানিকটা মেরে বলে —একজনের ওপর সবাই মিলে মধু ঝরাবার দরকার কি, একজনেই যথেষ্ঠ। বলি সুধাই বা চব্বিশ ঘণ্টা হাত পা কোলে করে বসে থাকে কেন? সে পারেনা নদের-চাঁদকে ভাত বেড়ে দিতে?

—ঠাকুরঝি? ওঃ! ····· যদিও লাগিয়ে দেওয়া স্বভাব বাসন্তীর নয়, তবু প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে তার, তাই তাচ্ছিল্যের এক অপরূপ ভঙ্গী করে বলে—ঠাকুরঝি নইলে আর কে বরের ভাত বাড়বার জন্য উপোস দিয়ে বসে থাকবে! সে কি বাড়ী আছে নাকি?

—বাড়ী নেই? কোথায় গেছে?

—কোথায় আবার, যেখানে দেশ সুদ্ধু লোক গিয়ে পড়ে আছে। একি আর আমি?

—মেলায় গেছে সুধা?

—তবে আবার কি? আর যাবেনাই বা কেন? তার স্বামীর তো কড়া নিষেধ নেই? দেখবে, চক্ষু সার্থক করবে, ভূতভবিষ্যত গোণাবে।

— নিকুচি করেছে তোর ভূতভবিষ্যত, ঠেঙ্গানি খেলে তবে সব সায়েস্তা

হয়। বলি আমার বাড়ী থেকে, আমার বারণ অগ্রাহ্য করে কার হুকুমে যায় সে?

—আহা, লোকের হুকুমের ধার সে বড্ডো ধারে কিনা! খুসি হলো চলে গেলো। আমার মতন নজরবন্দী তো নয় কেউ! এতো বন্দী হয়ে আছি, তবু সন্দেহের শেষ নেই।

চোখ ছল্ ছল্ করে আসে বাসন্তীর।

শশধর কিঞ্চিত নরম হয়ে বলে—সন্দেহর কথা হচ্ছে না, আমি এসব পছন্দ করি না। ওই লক্ষী ছাড়াটাকে এতো আস্কারা দেবে কেন তুমি?

—এই দেখো, আস্কারা আবার কি? যতোই হোক জামাই মানুষ, খাবার সময় একটু যত্ন করতে হবে না? আমার হাতে হাঁড়ি, কাজেই আমাকে যত্ন করতে হয়।

—জামাই ফামাই বুঝি না আমি, মেয়ে ছেলের সামনে এতো গান বাজনা হাসি মস্করা কিসের?

বাসন্তী হেসে ফেলে বলে—আচ্ছা, ঠাকুরজামাই কি আস্ত একটা মানুষ গো? দেখতেই চারখানা হাত পা ওলা মস্ত একটা জোয়ান। ওতো একটা শিশু মাত্তর।

—শিশু! তা' সে শিশু হ'তে পারে, তুমি তো শিশু নও? কোনটা ভালো দেখায় না সে জ্ঞান নেই?

বাসন্তী ভাতের হাঁড়িটাকে দুম্ করে তাকে তুলে রেখে বেজার মুখে বলে—জ্ঞান আমার খুব আছে, নেই তোমারই। চব্বিশ ঘণ্টা আপনার মনের আগুনেই গেলে! এই যে চক্কোত্তি জ্যেঠির নতুন জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ী ঝেঁটিয়ে সমস্ত বৌ ঝি দল বেঁধে মেলায় গেলো, তা'র বেলায় বুঝি দোষ হয়না?

—কার বেলায় কি হচ্ছে ও সব কথায় দরকার নেই, আমার পরিবার আমার মতে চলবে ব্যস!

শেষ রায় দিয়ে বাঁকানো ধনুকের মতো রোগাপাকানো দেহটাকে নিয়ে সোজা করবার বৃথা চেষ্টায় হাস্যকর ভাবে শব্দ করতে করতে চলে যায় শশধর।

শশধরের এই ঈর্ষায় বাসন্তী এক এক সময় কৌতুক অনুভব করে কিন্তু এক এক সময় অপমানিতও হয় বৈ কি। তবে যে লোকটাকে নিয়ে এতো অশান্তি শশধরের, তাঁর কাছে সহজ হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শশধরের এই কুটিলতা তার বুদ্ধির অগম্য। গৌরাঙ্গ জানে শশধর রাগী, কিন্তু কিসে তাঁর রাগ সে কথা কে বোঝাবে এই বড়ো মাপের শিশুটীকে? তাই পারত-পক্ষে গৌরাঙ্গ শশধরের সামনে পড়তে চায় না, আর আড়াল হলেই বাসন্তীর কাছে পরম কৌতুকে তার সমালোচনা জুড়ে দেয়—ওই যে আসছেন দুর্ব্বাসা ঠাকুর, এইবেলা এই ব্রাহ্মণ ভোজনটি সাঙ্গ করিয়ে ফেলুন। দাদাকে দেখলেই বুঝলেন বৌদি, আমার কেমন যেন হাসি পেয়ে যায়, পাছে হেসে ফেলি ওই ভয়ে সহজে আর দাদার সামনে বেরোই না।

হয়তো বা কখনো হেসে হেসে প্রশ্ন করে- আচ্ছা বৌদি, দাদা যখন জন্মে ছিলো লগ্নটা কি ছিলো বলুন তো? ভোঁদড় লগ্ন বোধ হয়!

বাসন্তী হেসে কুটি কুটি হয়ে বলে— 'ভোঁদড় লগ্ন' আবার কি ঠাকুরজামাই? এমন অনাসৃষ্টি কথাও বলতে পারো তুমি!

গৌরাঙ্গ বলে—অনাসৃষ্টি কিসের? কাঁকড়া লগ্ন হতে পারে, বিছে লগ্ন হতে পারে, ভোঁদড় লগ্নই বা হবে না কেন? আমার স্থির বিশ্বাস দাদা ওই লগ্নে জন্মেছে। উঃ কি বদ মেজাজ বাপ! হাসতে যেন শেখেনি।

শশধর রাগ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার পর গৌরাঙ্গ এসে খেতে বসলো।

বাসন্তী ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে বললো—তোমার সে মাছ কিন্তু এবেলা আর ভোগে লাগলো না, ওবেলা খেও। ঠাকুরঝির তো এখনো দেখা নেই।

গৌরাঙ্গ বলে—আপনার ঠাকুরঝি ? তাঁকে যে দেখলাম মেলাতলায় মহানন্দে একদল সখীর সঙ্গে পাঁপরভাজা খাচ্ছেন। আমি তো দেখতে পেয়েই গা ঢাকা দিয়েছি বাবা।

বাসন্তী বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—মেলাতলায় আবার কখন গেলে তুমি ? এই তো এলে ? এসে এতোক্ষণ ভাঙা বাজনা পালিশ করলে, তা'পর চান করে এই এসেছো।

—আহা এখন কেন, বাড়ী ঢোকবার আগে। একেবারে মেলাতলা ঘুরে বাড়ী এলাম যে।

—বলো কি ? ওই বাজনা ঘাড়ে আর মাছ হাতে ? পাগল না কি ?

—পাগল মানে? লোকের বোঝা তো ঘাড়ে করে বেড়াইনি। নিজের সখের বোঝা নিজের ঘাড়ে বইবো এতে আর লজ্জা কি ? কিন্তু ভাবছি সুধামুখী যে বড়ো মেলাতলায় যাবার অনুমতি পেলেন ? দাদার পায়ে ধরে বোধহয় ?

—হুঁঃ! তা' আর নয় ! দাদার অগোচরে, বুঝলে মশাই !

—তাই নাকি ? তা' হলে আজ সুধামুখীর কপালে বিস্তর দুঃখু লিখেছে বিধাতা, কি বলেন বৌদি ? বাদলাটাও বোধহয় গেছে ?

—গেছে ! গেছে মানে ? সে তো আজ এই তিন দিন ওখানেই পড়ে আছে।

—বটে, ব্যাটা খুব লায়েক হয়ে উঠেছে দেখছি। ···পালংএর ঘণ্ট আর একটু আনুন দিকি, হাতখানি যা ফাইন্ বাস্তবিক সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা উচিত। আর রাঁধেন বটে আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ, আহা !

বাসন্তী বলে—চুপ চুপ ! সর্ব্বনাশ ! গুরুজন না ?

—গুরুজন বলেই তো থেমে গেলাম গো বৌদি! বুড়ি তেল দেবে না ঝাল দেবে না— রান্না না জাবনা! রান্নাটি আপনার হাতে তাই এখনো টিঁকে আছি। নইলে— শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের প্রাণমাতানো রান্না আর সুধামুখীর বাক্য সুধা, আহা! কবে লোটা কম্বল নিয়ে পালাতে হতো।

হা-হা-হা করে হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ। বাসন্তীও না হেসে পারে না। গৌরাঙ্গর উপস্থিতিটাই যেন আনন্দের আলো ছড়ায়। 'হাসাহাসি করবো না ওর সঙ্গে' বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকলেও সে প্রতিজ্ঞা কখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

বাসুলডাঙা গ্রামটা যে খুব জনবহুল এমন নয়, তবে রেলষ্টেশন একটা আছে। বোধ হয মা জয়চণ্ডীর দৌলতেই তার এ হেন সৌভাগ্য। বৎসরান্তে একবার করে এই মেলায জমজমাট তো আছেই, তা ছাড়াও নানা উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে যাত্রী সমাগম হয়।

'স্টেশন মাষ্টার' নামের গৌরব বহন করে যিনি বিরাজিত, যদিও দিনে রাতে মাত্র দু'টিবার তাঁকে ডিউটি দিতে হয়, তবে অলিখিত আইনে বাসুলডাঙা স্টেশনের 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্য্যন্ত সবই তাঁর ডিউটি।

পিতৃমাতৃ প্রদত্ত নাম একটা অবশ্যই আছে ভদ্রলোকের। কিন্তু বাসুলডাঙায় সে নামের কোনো ব্যবহার নেই, এখানে তিনি 'মাষ্টারবাবু' নামেই পরিচিত।

লোকটি এক অদ্ভুত প্রকৃতির।

অবিবাহিত ভদ্রলোক, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উগ্রচণ্ডা, কিন্তু ভিতরে লুকোনা আছে একটা দরদী হৃদয়। গৌরাঙ্গ বলে 'ঝুনো নারকোল'।

গৌরাঙ্গর বন্ধুলোকের মধ্যে মাষ্টারমশাইকে প্রায় প্রধান বললেও ভুল

হয় না। বয়সের ব্যবধান এখানে বিলুপ্ত। গৌরাঙ্গকে কারুর দরকার পড়লে, অবধারিত যে সে আগে খুঁজতে যাবে স্টেশনে। টিনের শেড্ দেওয়া ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে বসে দুটী অসমবয়সী বন্ধু পরিকল্পনা করে একটা যাত্রার দল খোলার। একটা যাত্রা পার্টি খুলতে যা কিছুর দরকার সবই এষ্টিমেট হয়ে আছে তা'দের, শুধু টাকা জোগাড় হলেই হয়।

নামকরণও হয়ে আছে "ভবঘুরে অপেরা পার্টি।"

খাওয়া দাওয়ার পর গৌরাঙ্গ সদ্য সংগৃহীত বাদ্যযন্ত্রটি আবাব কাঁধে তুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে রওনা দিলো স্টেশনের দিকে। খালি গায়ে একটা হারমোনিয়ম কাঁধে নিয়ে রাস্তায় ছোটা অপরের দৃষ্টিতে হাস্যকর কি না এ কথা খেয়াল নেই গৌরাঙ্গর। নিজের ছেলের সঙ্গে খেলা করতে সে ছাগলছানা কাঁধে নিয়েও দৌড়য়।

সুধামুখী সে দৃশ্য দেখে বলে—গলায় দড়ি, গলায দড়ি, সাতজন্ম নিজের ছেলেটাকে কোলে নিতে দেখলাম না, ছাগল ছানা কাঁধে করে খেলা করছেন খোকা!

গৌরাঙ্গর কানে গেলে উত্তর দেয়—পশু পক্ষীকে কাঁধে করতে তো ভয় নেই গো, খুসি হলো কাঁধে করলাম্ খুসি হলো জুতোর ঠোক্কর দিলাম, আর মনিষ্যিকে? ওরে ব্যস! একবার কাঁধে চাপালে রক্ষে আছে? চিরটা কালের মতো চেপে বসে থাকবে, কাঁধ থেকে আর নড়বেনা।

সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে—ও তাই? তাই জন্যেই জন্মে কক্ষনো ছেলেটাকে কোলে করতে সাধ হয় না কেমন?

—তা' আবার বলতে—গৌরাঙ্গ অম্লান বদনে বলে—তা'র ওপর আবার তোমার ছেলে। সে তো আস্কারা পেলে—

সুধামুখী কোনোসময়েই স্বামীর প্রতি সুধাবর্ষণে কার্পণ্য করে না। হাত মুখ নেড়ে বলে—শুধু আমারই ছেলে কেমন ? কেন নিজে যদি গুণের সাগর, ছেলেকে নিজের মতো করে তোলো ? ✓

—হবে হবে—গৌরাঙ্গ বলে—সিপাইকো ঘোড়া হবে বৈকি। আর একটু বড়ো হ'তে দাওনা ছোঁড়াকে, দেখো কি রকম তালিম দিই। আমাদের যাত্রা পার্টির প্রথম বই হবে দাতাকর্ণ, তাইতে বাদলাকে আমি বৃষকেতুর পার্ট দেবো।

যাত্রা পার্টির গল্প সকলেরই জানা। মাষ্টারবাবু যে নিঃসঙ্গ অবসরের মুহূর্ত্তগু ল বৃথা অপচয় করেন না, রেলকোম্পানীর দৌলতে সংগ্রহ করা দিস্তে দিস্তে বালির কাগজের উপর অবিরত কলমের আঁচড় কেটে চলেন 'পালা' তৈরি করতে, এও কারো অবিদিত নেই। পেটে কথা থাকে না গৌরাঙ্গর।

বৃষকেতুর প্রসঙ্গে সুধামুখী দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। বলে—বটে বটে! বাদলাকে তুমি যাত্রার দলের ছোঁড়া করবে ? যেমন বুদ্ধি তেমনি তো কথা হবে ? বুঝে বুঝে কেমন পার্ট বেছেছেন ছেলের জন্যে, 'বৃষকেতু ! তা' তুমি যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ, ছেলেকে তুমি কাটতেও পারো।

গৌরাঙ্গ রাগও করে না আহতও হয় না, বলে–আরে বাবা, কেটে জোড়া দিতে পারলে ভয়টা কি ? বাদলাকে না হ'লে আমাদের "ভবঘুরে অপেরা পার্টি" চলবে কিসে ? ওকে কিসে কিসে কি কি পার্ট দেবো সে পর্য্যন্ত আমার ঠিক করা আছে।

এ সব অবশ্য অন্যদিনের ব্যাপার, আজতো এখনো দীর্ঘ বিরহের পর দেখাই হয় নি সুধামুখীর সঙ্গে। "ভবঘুরে অপেরা পার্টির" প্রথম উপকরণ

হারমোনিয়মটা মাষ্টারদা'কে না দেখানো পর্য্যন্ত স্থির হ'তে পাচ্ছিলো না গৌরাঙ্গ।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই মাষ্টার মশাই প্রায় দু'বাহু প্রসারিত করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেন—আরে এসো এসো গোরাচাঁদ! নদে ছেড়ে এতো দিন ছিলে কোথায়?

—আর বলেন কেন মাষ্টারদা,—গৌরাঙ্গ কাঁধ থেকে বাজনাটা নামিয়ে সন্তর্পণে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর রেখে বলে—সেই ব্যাটা গোবর্দ্ধন এইটার জন্যে কম ভোগান ভুগিয়েছে? আমি হতভাগার আশ্বাস পেয়ে ছুটে গেলাম, আর আমার গরজ দেখে ব্যাটা বলে কি না—'দেবোনা'।

যদিও এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, বিস্ময় প্রকাশের কিছু নেই, তবু মাষ্টার মশাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—বলো কি?

—তবে আর বলছি কি? আজ দশদিন ব্যাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি। ও যতো টালবাহানা করে, আমি ততো চেপে ধরি।

—লোকটা খুব ত্যাঁদোড় কি বলো?

—একের নম্বর। তবে কি না বুঝলেন মাষ্টারদা, আমিও কম ঘুঘু নই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন করে পড়ে রইলাম ওর বাসায়। নে বাবা কদিন ভাত দিতে পারিস দে।

হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ নিজের বুদ্ধির কেরামতিতে। ষ্টেশন মাষ্টারমশাইও হাসেন। তা'পর বলেন—গোবর্দ্ধনের যাত্রাপার্টি তা'হলে লাটে উঠলো?

—তা' উঠলো! হতভাগা বলে কি না এরপর চালের ব্যবসা করবে। শুনুন দিকি কাণ্ড! ছোট খাটো যাই হোক, তুই একটা অধিকারী ছিলি, কতো খানি মান সম্মান, সে জায়গায় তুই হ'তে যাবি আড়ৎদার? ছি ছি!

মাষ্টারমশাই উদার হাস্যে বলেন—মর্ম্ম বোঝে না, বুঝলে না ভায়া—মর্ম্ম বোঝে না। যাত্রার দল যে খুলেছিলো ব্যাটা, সেও নেহাৎ ব্যবসা করতেই

সেই যে কথায় বলে না—"চাষা কি জানে রে মদের স্বাদ—"। এ জিনিশটা বেশ ভাল কি বলো ভায়া ?

বলা বাহুল্য সদ্যলব্ধ হারমোনিয়মের প্রসঙ্গেই কথাটা উচ্চারিত হয়।

গৌরাঙ্গ নিঃশঙ্ক চিত্তে বলে—নিশ্চিত। তা' নইলে দিতে অতো নারাজ হয় ? দেখতে অবিশ্যি—

মাষ্টারমশাই বলেন—তা'র সামনে বাজিয়ে টাজিয়ে দেখে এনেছো তো ?

—হুঁঃ! সে তেমনি পাত্তরই বটে! শেষ অবধি জিনিশটা বার করতে চায় না। পেয়েছি আর রেলে উঠেছি।

—আওয়াজটা খারাপ নয় কেমন ?

—না, না। শুনুন না একটু বাজাই।

মহোৎসাহে বাজনাটাকে কোলের গোড়ায় টেনে নেয় গৌরাঙ্গ।

কিন্তু একি বিপত্তি!

ত্যাঁদোড় গোবর্দ্ধনের যন্ত্রটাও গোবর্দ্ধনের মতোই ত্যাঁদড়ামি করছে যেন! গোটাকতক রীড তুমুল আর্তনাদ করতে সুরু করে, আর গোটাকতক যেন ভারসাম্য রক্ষার্থেই একেবারে মৌনাবলম্বন করে বসে থাকে।

রীডের খাঁজে খাঁজে ফুঁ দিয়ে দিয়ে কাহিল হয়ে ওঠে বেচারা গৌরাঙ্গ।

শেষ পর্যন্ত মাষ্টারমশাই বলতে বাধ্য হন—একটু বেশী পুরণো বলেই মনে হচ্ছে গোরাচাঁদ!

—আহাহা পুরণো নয় তা'তো বলছিনা! আপনিও তো পুরণো, গুণী কি না সেইটাই দেখা দরকার। ব্যাটা শেষটায় ঠকালো ?

—একটু সারিয়ে টারিয়ে নিলে—

—সারাবো আর কোথায়, একতো আমাদের গদাইয়ের দোকান ? লিখে

রেখেছে "সর্ব্ব প্রকার বাদ্যযন্ত্র সারানো হয়", ওই পর্য্যন্ত। ওস্তাদ কারিগর নেই।

—তাইতো!

বিষন্ন মনে বসে থাকে দুজনেই। অপেরা পার্টির প্রথম মালটাই লোকসান।

হঠাৎ একসময় গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে গৌরাঙ্গ, বলে—যাক ভালোই হলো, গোড়াতেই একটা লোকসান হয়ে দোষ খণ্ডে গেলো। এরপর আর হবেনা। কি বলেন মাষ্টারদা ?

—তা বটে গোরাচাঁদ। এটা আমার মনে লাগছে। যেমন টীকে দিলে বসন্তর ভয় কাটে। তাই তো - একথাটা তো ভেবে দেখিনি। ঠিক বলেছো।

বয়সে অনেক ছোট বন্ধুটিকে এইভাবে শিশুর মতোই ভোলান মাষ্টারমশাই।

আবার এ পক্ষও ভোলায় বৈকি। কোথায় অপেরা পার্টি তার ঠিক নেই, পালার পর পালা জমছে, তবু নতুন পালার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে গৌরাঙ্গ। তাড়া লাগিয়ে বলে অহল্যা উদ্ধারে হাত দিলেন মাষ্টারদা ? এই বেলা সুরু করুন। এরপর পার্টি যখন খুলবো, তখন যে আর কূল দিয়ে উঠতে পারবেন না।

মাষ্টারমশাই ঈষৎ উদাসীনতায় বলেন - আরে ভাই লিখলাম তো অনেকগুলো সাপব্যাঙ, কি হলো ঈশ্বর জানেন। দু'একটা পালা অভিনয় নাহলে আর লিখতে তেমন উৎসাহ পাচ্ছিনে।

গৌরাঙ্গ জানে যে উৎসাহের শেষ নেই মাষ্টারমশাইয়ের, হয়তো ইতিমধ্যে লেখা ফিনিশ হয়েই গেছে, এশুধু একটু চক্ষুলজ্জা। খানিক পরেই উস খুস করতে করতে বলবেন খানিকটা হিজিবিজি করেছিলাম, দেখতো গৌরাঙ্গ হচ্ছে কিনা।"

তাই নিজেই সে সেই চক্ষুলজ্জাটুকু দূর করতে হৈ হৈ করে ওঠে--উৎসাহ পাচ্ছেন না মানে? বলি অপেরাপার্টির কাজ আরম্ভ হলে সময় পাবেন? তখন যে ইষ্টিশান মাষ্টার থেকে একেবারে ডিরেকশান মাষ্টারে প্রমোশন! হা-হা-হা!

মাষ্টারও হাসেন।

হাসি থামিয়ে গৌরাঙ্গ বলে—আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আসছি এ ক'দিনে 'অহল্যা উদ্ধার' শেষই হয়ে গেলো বুঝি। আপনি কিনা কলম গুটিয়ে বসে আছেন?

মাষ্টার যেন তাচ্ছীল্যভরে বলেন—হ্যা শেষ না হাতী! করছিলাম খানি-কটা, ইয়ে - তেমন সুবিধে হচ্ছেনা। দেখো দেখি একটু—

দ্রুত চাঞ্চল্যে ড্রয়ার টেনে কাগজের গোছা টেনে বার করতে চেষ্টা করেন মাষ্টার। এটা টানতে ওটা হাতে উঠে আসে। অতঃপর খোলা কাগজগুলি গোছ করে সরে আসেন জানলার দিকে।

বয়সের ভার মনকে জব্দ করতে পারেনি, কিন্তু জব্দ করেছে বহিরিন্দ্রিয়ের। পড়তে আজকাল চোখটার একটু কষ্ট হয়।

জানলার কাছে এসেও খুব ভালো দেখতে পান না মাষ্টার, বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। ক্ষুব্ধ হাস্যে বলেন—আজ আর হলো না ভায়া।

—তা' আমাকে না হয় দিন না?

—না না, তুমি সে ঠিক বুঝতে পারবেনা ভাই - কাগজগুলো আঁকড়ে ধরেন মাষ্টার, তারপর কুণ্ঠিত ভাবে বলেন—অনেক কাটাকুটি আছে, নিজে নিজে না হলে—ঠিক—ইয়ে - আজ থাক।

—তা'হলে এখন?

—তা'র চেয়ে তুই বরং একটা কেত্তন গা।

—কেত্তন? এই ভর সন্ধ্যেবেলা?

—তা'তে কি, সন্ধ্যেই তো গানের সময় রে।

গৌরাঙ্গ অবশ্য গান গাইতে এক পায়ে খাড়া, তবু—গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে আক্ষেপ করে বলে—হারমোনিয়মটা মার্ডার কেস্ হলো, দূর !

—তা হোক্ তুই গা' না। বরাবরই তো এমনি গাইছিস। খোল্টা পাড়বো ?

—না না খোল্ থাক। বরং চল বাইরে গিয়ে বসি।

ষ্টেশন প্লাট্ফরমে এসে জড়ো করা চারটি পাথরের নুড়ির ওপর বসে গৌরাঙ্গ। প্লাট্ফরম বলতে অবশ্য নামটাই সার। দুটো কাঠের খুঁটিতে আটকানো একখানা কাঠের ফলকে লেখা 'বাসুলডাঙা'। অনতিদূরে একটা ইঁদারা এবং তারই আশে পাশে অনেকগুলো ঝুমকোজবার গাছ। রেল-কোম্পানী অদুব ভবিষ্যতে এ জায়গাটার উন্নতি সাধন করবেন এই আশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ জায়গায় জায়গায় স্তূপীকৃত করা আছে পাথরের নুড়ি খোয়া।

খোযার গাদায় বসে পড়ে গুন্ গুন্ করতে করতে এক সময গলা খুলে যায়· আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় গায়ককে ভালো করে দেখা যায় না, শুধু তা'র উদাত্তস্বর যেন আকাশে উঠে আবার করুণ মুর্ছনায় পৃথিবীর ধূলি-কণায় মিলিয়ে যায।

দ্বিতীয কোনো শ্রোতা নেই, প্রৌঢ় একটি গ্রাম্য ষ্টেশনমাষ্টারের বিহ্বল কানে বারবার ধ্বনিত হ'তে থাকে।

"সখী রহিতে নারিনু ঘরে ! নিরবধি বলে কানু কলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে—"

এতো স্ফূর্ত্তিবাজ লোকটা, কিন্তু সুরের মধ্যে যেন বেদনা গলে গলে পড়ে। কে জানে এতো হাসিখুসির নীচে কোথায় লুকোনো থাকে এই বেদনার সাগর।

মেলাতলা থেকে বাদলকে ধরে নিয়ে এলো সুধামুখী। ও যখন নারায়ণ দর্শনের শেষে আনন্দে ছলছল করতে করতে ফিরছিলো সঙ্গিনীদের সঙ্গে, তখন দেখলো বাদল একটা মাদুরওলার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে মাদুরের থাকের ওপর বসে গল্প করছে।

কোনকালে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে, সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে সাত বছরের ছেলেটা। ঠিক বাপের মতোই খেয়ালী স্বভাব পেয়েছে ছেলে। মেলার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে কিন্তু দলছাড়া হয়ে। যেখানে সকল ছেলের ভীড় সেখানে বাদল নেই। নেই নাগর দোলার দিকে, নেই খাবারের দোকানের আশে পাশে, নেই চতুর্ভুজের তাঁবুর ধারে কাছে।

বাদল আছে ছবির দোকানের সামনে, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এখন একটা কোণ চেপে বসেছে। এই ছবিগুলি যেন অনন্ত রহস্য লোকের বার্ত্তাবাহক। ···কাদের ছবি এ সব? দেবতা অবশ্যই কিন্তু এই সব দেব দেবীর নামই বা কি মহিমাই বা কি? সোজাসুজি দুর্গা কালী কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব সত্যনারায়ণ এঁদের চেনে বাদল, এঁরা তো সবাই গৃহপোষ্য ঠাকুর, কিন্তু আরো কতো বৈচিত্র্য! কতো অদ্ভুত!

কেন একজন মেয়েমানুষ নিজের গলা কেটে নিজেই সে রক্ত পান করছেন, কেনই বা মহাদেব এমন একজন মেয়েমানুষকে কাঁধে করে বেড়াচ্ছেন যার শরীরের মাত্র আধখানা আছে আধখানা নেই। কে জানে!

ছবির নীচে নীচে নাম লেখা "শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা" "জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ" "ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন" এমনি আরো কতো কিছু, বাদল পড়তে পারে, কিন্তু মানে বুঝতে পারে না। এক একটা ছবির সঙ্গে কতো অলৌকিক কাহিনী জড়িত, কি না জানি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর রহস্য! যে রাজ্যের চাবি আজও বাদলের হস্তগত হয়নি, সেই রাজ্যের জীব এরা।

আশ্চর্য্য ! এই ছবির রাজ্য ছেড়ে লোকে কাঁচের চুড়ি দেখছে, দেখছে এ্যালুমিনিয়মের বাসন ! সাত বছরের ছেলে, কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্নের সাত সমুদ্র।

সুধামুখী ওকে বোঝে না, একটার বেশী হু'টো প্রশ্ন করলেই বলে—মেলা বকাসনে বাদলা, থাম্।

মাহুরওলার কাছে বাদলের মন খুলে গেছে, কি কি ছবি রয়েছে পাশের দোকানে মহোৎসাহে তারই ফিরিস্তি দিচ্ছে।

সুধামুখী দেখতে পেয়ে ধরে আনে।

ওরা বাড়ী ঢুকতেই বাসন্তী ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে—এই যে বাদল-বাবু ! মেলা দেখা হলো ? তোর বাবা এসেছে যে।

বাদল লাফিয়ে ওঠে—বাবা ? কই ?

সুধার আজ মন ভালো, তা ছাড়া দশ বারো দিন বিরহের পর পতি-দেবতার প্রত্যাগমন সংবাদটা একটু সুখের আমেজ এনে দিলো। তাই ছেলের কথার জবাবে সরসহাস্যে বলে—'কই'। দেখ্‌গে তোর মামীর আঁচলটা খুঁজে, আছে নাকি।

বাদল বিমূঢ়ভাবে একবার মায়ের ও একবার মামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধরে ফেলে কথাটা রহস্যমাত্র। অতএব 'য্যাঃ' বলে দাওয়ায় ওঠে। তার পর এদিক ওদিক উঁকি মারে।

—বেরিয়ে গেলোরে এইমাত্র বেরিয়ে গেলো। কতোবার তোর খোঁজ করলো শেষ অবধি খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলো।

কথাগুলো প্রত্যক্ষ বাদলের উদ্দেশে হলেও পরোক্ষে এটা সুধামুখীকেই 'জানান' দেওয়া। তবে নাকি চট্ করে এখন মান খুইয়ে ননদের সঙ্গে কথা কইবেনা তাই।

কইবেই বা কেন ? ভূতভবিষ্যত জেনে সুধামুখী হয়তো নিজের কতো

সৌভাগ্যের বার্ত্তা বহন করে এসেছে, আর কতো না মুরুব্বিয়ানা চালে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবে সে সংবাদ, আর বেচারীর মত হাঁ করে শুনতে হবে বাসন্তীকে। অজ্ঞাত থাকবে শুধু বাসন্তীর ভূতভবিষ্যত।

নাঃ নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন করবে না বাসন্তী, অতএব বাদলই ভালো।

কিন্তু সুধামুখী যে বলবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে মরছে। তাই ইতস্ততঃ করে বলে এসেই বাবুর বেরোন হলো কোথায় ?

—নিশ্চয় ইষ্টিশানে।

—হুঁ! বাড়ীতে যেন কাঁটা ফোটে! মা নেই ?

—না। জামাইয়েব সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছেন।

—ভালো! বাড়ীতে পা দিয়েই ঝগড়া ? কিন্তু শুনে যা এলাম বৌদি, সে তো একেবারে তাজ্জব।

এই টোপটুকু ফেলে মিনিটখানেক নীরবতা অবলম্বন করে সুধা। বাসন্তীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি না পেলে বলেই বা কি করে ?

কিন্তু বাসন্তীর চোখ অন্যদিকে।

অগত্যা মান খোয়াতে সুধামুখীকেই হয়। ভাবী সৌভাগ্যের বার্ত্তা না শোনাতে পেলে আর সার্থকতা কি ?

তাই আপন মনে বলে ওঠে তাই বলছিলাম বৌদি, তুমি কি ভাগ্যি করেই এসেছিলে! পৃথিবীর মেয়েছেলে এসে জড়ো হয়েছে, এক তুমি ছাড়া বোধ হয় দ্বিতীয় কেউ বাড়ী বসে নেই। দাদা যেমন একজেদি তুমিও তেমনি মানিনী। স্বামী 'বাঘরাশ' হলেও লুকিয়ে চুরিয়ে কাজ সারতে হয়! তা' তোমার আবার তা' চলবেনা। এই যে আমি ঘুরে এলাম, কি হলো ?

—ভাইয়ের সামনে পড়ে দেখো কি হয়!

বাসন্তীর উক্ত ভীতিপ্রদর্শন উড়িয়ে দিয়ে সুধা তাচ্ছীল্যভরে বলে— কি আর করবে, নাহয় দুটো গালমন্দ দেবে। গুরুজন যদি দেয়ই দুটো গাল

মন্দ, গায়ে ফোস্কা তো পড়বেনা! আর ধমক চমকে 'দেখে আসাটা' কেড়ে নিতেও পারবেনা। আমিতো বাবা এই সার বুঝি। কিন্তু ধমকের বদলে ভগবান দর্শন! তুল্য মূল্য হিসেব করো?

হিসেব বাসন্তীর হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়, কিন্তু সুধার উপদেশ বাসন্তীর কাজে লাগাবার প্রবৃত্তি নেই। লুকোচুরিতে তার বড়ো ঘৃণা।

সুধা একটা নিশ্বাস ফেলে যেন বাতাসকে উদ্দেশ করে বলে—জীব তরাতেই এসেছেন! নইলে—কি দরকার ছিলো ওঁর বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এই বাবুলডাঙ্গায় এসে হাজির হতে? ··· সিকিটা কাটা-কৌটায় ফেলে দিয়ে পূর্ব্বমুখ হয়ে হাত জোড় করে নিজের নাম বলে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করলাম, আর বলবো কি সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতর থেকে উত্তুর! —অবাক অবাক!

বাসন্তীর বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, তবু তীব্র উত্তেজনাকে কষ্টে দমন করে মুখে নিস্পৃহতার ভাব এনে বলে—অবাকটা কি শুনি!

—অবাক নয়? বলো কি বৌদি? বাইরে থেকে শুধোলাম, আর ভেতর থেকে উত্তুর!

বাসন্তী যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, উত্তেজনায় হাত পা কাঁপতে থাকে ওর, নেহাৎ নাকি হঠাৎ বসে পড়লে ভালো দেখায় না বলেই দাওয়ার খুঁটিটা চেপে ধরে কষ্টে সহজ হয়ে বলে—কথাটাই বা কি? উত্তুরই বা কি?

সুধামুখী এবার দর বাড়ায়, বলে- ঠাকুর দেবতার কথা হেলাফেলা নয়, অছেদ্দা করে বোলোনা বৌদি! একেই তো এ জন্মে—যাক্ গে, দেবদেবীকে একটু মানতে শেখো বৌদি! উঃ যাই ভাগ্যিস গিয়েছিলাম, তাই না নরজন্ম সার্থক হলো। আর তেমনি কি মেলার বাজার! হেন সামিগ্রী নেই যা আসেনি। গিয়ে মনে হয় ভগবান কেন একশোটা চোখ

দেয়নি। অভাগ্যির কপাল তাই কেনাকাটার কথা মুখে আনবার হুকুম নেই, নইলে ইচ্ছে হয় সব কিনে আনি।

কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত বাসন্তীর চৈতন্য-জগতে এখন আর এ সব কথা পৌঁছয় না। দুঃখ অভিমান ক্ষোভ ঈর্ষা সব কিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার। তাই নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই থাকে।

সুধামুখী বোধ হয় দর নামিয়ে আর কিছু বলতো, কিন্তু হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করলেন নিভাননী।

—সুধা এসেছিস? বাদলা ফিরেছে? বেয়াইয়ের ব্যাটা গেলেন কোথায়? এসেই আড্ডায় বেরিয়েছেন তো নবাবপুত্তুর? তোকে কিন্তু আমি মাথার দিব্যি দেবো সুধা, যদি দেখেই একেবারে আহ্লাদে গলে গিয়ে মান খুইয়ে কথা ক'স! মেয়েমানুষকে একটু শক্ত হ'তে হয় বুঝলি?

সুধা বিরক্তিভরে বলে—বাবাঃ বাবাঃ! দেখে এলাম একটা কতো বড়ো জিনিশ, এখন তোমার যতো সব আজেবাজে কথা।

— দেখে এসেছিস?

কি করতে গেলাম তবে?

— কি দেখলি?

ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে বাসন্তী।

—যা দেখলাম, সে একেবারে অবাক কাণ্ড!

সুধার কথার ভাঁড়ারে ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ আর বেশী নেই, তাই 'অবাক' কথাটার ওপরই যতোটা সম্ভব উচ্চারণের জোর দেয়।

—অবাকটা কি শুনি?·· ওরা তো বলছিলো না কি পয়সা আদায়ের ফন্দী।

—ওদের মুখে আগুন লাগুক! বললে বিশ্বাস করবে না— একেবারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ!

—শঙ্খ চক্র নাকি ওরা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

সুধামুখী আরো বিরক্ত হয়ে বলে—ধরিয়ে দেবে না তো কি এই ঘোর কলিতে তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে সেই সব নিয়ে নামবেন? অবিশ্বাস যে করবে সে নরকে পচে মরবে। সত্যি না হ'লে কখনো মনের কথা বলে দিতে পারে?

—তুই কি কি জিগ্যেস করলি?

—যা নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি তাই জিগ্যেস করেছি!… উত্তুর হলো—ওর মতিবুদ্ধি ভাল হবে, আমার দুর্দ্দশা গিয়ে সুদশা আসবে, আর ছেলে আমার রাজতুল্য হবে।

মেয়ের এহেন সৌভাগ্য সংবাদে আনন্দ প্রকাশের পরিবর্ত্তে নিভাননী মুখখানা বাঙলার পাঁচের মতো করে বলে ওঠেন—টাটের শালগ্রামের মতন ফুল তুলসী দিয়ে পুষে রেখেছি, তবু যে কিসে তোমার দুর্দ্দশা মা তা'ও বুঝি না।

সুধামুখী মুখ ঘুরিয়ে বলে—ভাইয়ের সংসারে হাত তোলায় পড়ে আছি, আর সাতবেলা তোমার মুখনাড়া খাচ্ছি, একে আবার দুর্দ্দশা না বলে সুদশা বলতে হবে নাকি?

মাতা কন্থার স্নেহ সম্ভাষণ প্রায়ই এই রকম তিক্ততায় পর্য্যবসিত হয়।

বাসন্তী ততক্ষণে বাদলকে ডেকে খেতে বসিয়েছে।

পল্লীগ্রামে রুটি লুচির রেওয়াজটা কম, দ্বিতীয় প্রস্থ ভাত নিয়েই বসেছে বাদল। বাসন্তী সস্নেহে বলে—দুধ পাটালী দিয়ে ভাত খাবি বাদল?

—হুঁ—উ—উ!

দুধ আর পাটালী নিয়ে বসে পড়ে বাসন্তী চুপি চুপি বলে—নরনারায়ণ আর কতোদিন থাকবে রে বাদল?

— তা' জানি না তো।

—ওমা সে কিরে? সারাদিন ঘুরলি সেখানে, আর আসল কথাটাই শুনে এলি না?

বাদল খেলো হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে— নিধু বলছিলো - আর দুদিন মোটে থাকবে।·· আচ্ছা মামী, তুমি 'অশোক বনে সীতা' মানে জানো?

সহসা এহেন প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে বাসন্তী আশ্চর্য্য হয়ে বলে—একথা কে বললে রে তোকে?

—বলেনি কেউ, তুমি মানে জানো কি না তাই বলো না?

বাসন্তী একটু রহস্যের হাসি হেসে বলে— জানি বৈকি, 'অশোক বনে সীতা' মানে আর জানি না? মেলার বাজারে ছবি দেখে এসেছিস বুঝি? সীতা গাছতলায় বসে আছেন, আর দুপাশে দুটো চেড়ি না?

বাদল সোৎসাহে বলে—হ্যাঁ গো! কত্তো যে ছবি সে আর তোমাকে কি বলবো। সব ছবির নাম কি আর পড়তে পারি, যা শক্ত শক্ত বানান বাবাঃ! অশোক বনে সীতার মানে কি বললে না তো?

—মানে? সীতাকে রাবণ ধরে এনে—ইয়ে—সীতা জানিস তো?

—হ্যাঁ! রামের বৌ তো? সেই যে রামসীতা পুতুল পেলাম ওবারের মেলায়।

তা' সেই সীতাকে রাবণ ধরে এনে অশোকবনে আটকে রেখেছিলো, আর সীতা পাছে পালিয়ে যান তাই দু'পাশে দুটো চেড়িকে বসিয়ে রেখে দিলো পাহারা দিতে। সীতা বেচারী—

কথা শেষ না হ'তেই বাদল বলে ওঠে—ঠিক যেমন তুমি।

আমি? ···বাসন্তী অবাক হয়ে বলে—আমি কি?

—এই তুমি যেন সীতা, মামা তোমাকে ধরে এনে আটকে রেখেছে, আর চেড়ি দু'টো যেন মা আর দিদিমা—

—সর্ব্বনাশ করেছে ! ওরে পাগলাছেলে চুপ চুপ ! আর কখনো বলিসনা এ কথা ?

হাসি চেপে ছেলেটাকে সামাল দেয় বাসন্তী, এই সর্ব্বনেশে কথা শ্বাশুড়ী ননদের কানে গেলে আর রক্ষে আছে ? কিন্তু আশ্চর্য্য ! অতোটুকু ছেলে কেমন করে পেলো এই অপূর্ব্ব লক্ষ্য শক্তি ?

বাসন্তীর মনের মধ্যে সত্যিই বুঝি বসে আছে এক বন্দিনী সীতা, যার চারিপাশে বেড়াজাল, মুক্তির পথ দেখতে না পেয়ে অহরহ যে হাঁপিয়ে উঠছে ।

ছেলেটা খেয়ে উঠে যাবার পর আরও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বাসন্তী, চমক ভাঙালেন নিভাননী । সশব্দে ঘরে ঢুকে বললেন—অমন পেঁচোয় পাওযার মতো ফ্যালকা মুখো হযে আছো কেন বৌমা । ঘরে সাঁঝ সন্ধ্যে পড়বে না ?

সাঁঝসন্ধ্যা !

তাইতো সন্ধ্যা হয় হয যে ।

নিভাননী বলেন—ননদাই এসেছে বলে এ বেলা যেন আবার একগঙ্গা রাঁধতে বোসোনা বাছা, সেই মাছ আছে তাই দিয়েই সারবে ।

গৃহস্থালীর কাজ করেন না নিভাননী, কিন্তু গৃহিনীপণাটুকু করতে ছাড়েন না ।

পরদিন সকালে একটা ঘটনা ঘটে অপ্রত্যাশিত ।

পাশের গ্রাম সোনাডাঙা থেকে দু'জন লোক আসে গৌরাঙ্গর খোঁজে, ভারী নাকি জরুরী দরকার তা'দের ।

শশধর তখন দাওয়ায় বসে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গিমায় অভিনিবেশ সহকারে দাঁতন

করছে। অপরিচিত লোক দুটির দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বলে—কাকে চান ?

—আজ্ঞে গৌরাঙ্গবাবুকে।

—গৌরাঙ্গবাবু! ওঃ!

'বাবু' শব্দটার ওপর একটা অহেতুক জোর দিয়ে শশধর আবার নিজের কাজে মন দেয়, যেন এরপর আর কোনো কথা নিষ্প্রয়োজন।

—ডেকে দেবেন তাঁকে ?

শশধর গম্ভীর ভাবে বলে—আমি ডেকে দেবো—এই ভরসায় আপনারা আসেননি নিশ্চয় ?

লোক দুটো এক মুহূর্ত্ত বিচলিত ভাবে তাকিয়ে থাকে, তা'র পরই ফিক করে হেসে বলে—আজ্ঞে তা' অবশ্য নয়।·· অতঃপর শশধরের উপস্থিতি অস্বীকার করে হাঁক দেয়—গৌরাঙ্গবাবু আছেন না কি ?

ঘরের মধ্যে টনক নড়ে সুধার, স্বামীকে ঠেলা মেরে বলে—এই ওঠো, কে ডাকছে তোমাকে।

গৌরাঙ্গ জেগে জেগে শুয়ে আলস্যের আরাম আস্বাদ করছিলো, উদাস ভাবে বলে—আমাকে আর কে ডাকবে ?

—কে যেন অচেনা গলা।

—অচেনা গলায় আমায় কে ডাকবে সুধামুখী ? চেনালোকেই ডাকে না! তোমার শোনার ভুল হয়েছে।

—শোনার ভুল হয়েছে ? ওই দেখোনা কান পেতে।

ততক্ষণে উপর্য্যুপরি ডাক পড়ে।

অগত্যাই উঠতে হয় গৌরাঙ্গকে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা লোক দরাজ গলায় বলে ওঠে—কি মশাই, গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে কি করে এসেছেন ?

—গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে ! কেন কি বলেছে সে ?

—জানি'না মশাই, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে চলুন।

শশধর দাঁড়িয়ে উঠে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, নড়তে পারে না। কি যে করে এসেছে গৌরাঙ্গ সে আর বুঝতে বাকী নেই শশধরের।

ঠিক হয়েছে ! ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেয তো আচ্ছা হয়।

গৌরাঙ্গ একবার ওদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তাচ্ছীল্যভরে বলে—ওয়ারেণ্ট তো বুঝলাম, কিন্তু কি বাবদ জানতে পারলে ভালো হতো না ?

—সেখানে গিয়েই শুনবেন ! কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁকে চতুর হাসি হেসে প্রথম ব্যক্তি বলে—আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার।

—আর আপনাদের হুকুম যদি আমি না মানি ?

—তা'হলে আজ্ঞে বেঁধে নিয়ে যাবার আদেশও আছে।

শশধর ততক্ষণে পায়ে পায়ে অন্দরে ঢুকেছে, কে জানে বাবা তা'কে শুদ্ধ যদি টানে, টানা অসম্ভব নয। কাজ কি সে ঝঞ্ঝাটে ? বাগানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় মারাই শ্রেয়।

গৌরাঙ্গ কিন্তু দমে না। দমবার ছেলেও সে নয়। এদের কথার উত্তরে বলে—বটে না কি ? একেবারে বেঁধে ? বেশ সেই চেষ্টাই করবেন। কাঁচা ঘুমটাই মাটি করলেন মশাই, ভদ্রলোককে ডাকতে আসার আর সময় পেলেন না ?

গৌরাঙ্গও অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ায়।

এ লোকটা ব্যস্ত হযে চেঁচিয়ে ওঠে—ও মশাই, ও গৌরাঙ্গবাবু শুনছেন ?

গৌরাঙ্গ যেতে যেতে বলে—চেঁচামেচি করে ঘুমের মৌজটা মাটি করে

দেবেন না মশাই, দয়া করে গলা কমান।

—আহা আসল কথাটাই শুনুন—

—একেবারে আপনাদের মহামান্য অধিকারী বাহাদুরের কাছে গিয়েই শুনবো। গৌরাঙ্গ চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে যায়…ততোক্ষণে বরং বেঁধে নিয়ে যাবার উপযুক্ত দড়িদড়া জোগাড় করে আনুন, আমি আর খানিকটা ঘুমিয়ে নিইগে।

ও চলে যেতেই লোক দু'টো মুখ চাওয়াচাবি করে একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে—হলো তো ?

—তাই তো ! এ যে উল্টো উৎপত্তি। নিবারণ ডাক না আর একবার ?

—তুই ডাক না ?

—দূর, খামোকা এক ফ্যাচাং ! —ও গৌরাঙ্গবাবু শুনছেন ?

বার বার ডাকতে থাকে তা'রা।

ওদিকে শশধর গিয়ে দালানে চৌকীর ওপর বসে পড়ে শিথিল কণ্ঠে বলে—এক গেলাস জল দেখি !

বাসন্তী জল এনে বলে—কি হলো ? মুখ ধুতে না ধুতে শুধু জল খাবে যে ?

—জল খাবো আমার খুসি।

—বেশ তো খাও না ! শুধু গেলাসে কুলোবে, না কলসীশুদ্ধু এনে দেবো ?

শশধর এ পরিহাস গায়ে না মেখে ঢক্‌ঢক্ করে জলটা খেয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে—যাও 'ঠাকুরজামাইকে' মাছের মুড়ো খাওয়াওগে যাও ?

—সক্কাল বেলা ও আবার কি বিচ্ছিরি কথা ?

—বিচ্ছিরি কথা ! আরো কতো বিচ্ছিরি কথা শুনতে হবে। ঠাকুর-জামাইয়ের নামে যে ওয়ারেণ্ট এসেছে।

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে—ওয়ারেণ্ট ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ! আসবে না ? গোবর্দ্ধন অধিকারীর হারমোনিয়াম চুরি করে পালিয়ে এসে বাছাধন ভেবেছেন পার পাবেন। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে।

বাসন্তী তীব্র প্রতিবাদে বলে ওঠে—ঠাকুরজামাই চুরি করে পালিয়ে এসেছে, এই কথা বিশ্বাস করেছ তুমি ?

—বিশ্বাস না করবার কারণও তো কিছু দেখছি না। তোমার ঠাকুর-জামাইটি তো সত্যি নদেব গৌরাঙ্গ নন। রাস্কেল ! শয়তান !

—ওমা ও কি, শুধু শুধু মানুষটাকে গাল দিচ্ছো কেন ? ওয়ারেণ্ট দেখেছো ?

—দেখবো ? আমি দেখতে যাবো, তোমার সখ হয়, তুমি দেখে এসো। উঃ পাঁচটি বছর ঘানি টানায় তবে ঠিক হয়।

বাসন্তী আর কিছু বলবার আগেই গৌরাঙ্গের দর্শন ঘটে। সে বোধকরি আবার একটু ঘুমিয়ে নেবার তালই খুঁজছিল।

শশধর ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে—জামিন টামিন আমি হোনা তা বলে দিচ্ছি।

—আচ্ছা দিওনা, থামো তো। ···কি ঠাকুরজামাই, কি অপকর্ম্ম করে এসেছো গোবর্দ্ধন অধিকারীর কাছে ? বাসন্তীর মুখে চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়না।

গৌরাঙ্গ হাই তুলে বলে—কে জানে এই প্রাতঃকালে যত্তো সব হাঙ্গামা ! দুর, কাঁচা ঘুমটাই মাটি করে দিলে। বলে অমনি না যাই বেঁধে নিয়ে যাবার

হুকুম আছে। নে বাবা দড়ি দড়া আন, ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নেই।

বাসন্তী মৃদুহেসে বলে—বেঁধে নিয়ে যাবার আদেশও আছে? অধিকারীকে কের্ত্তন শোনাওনি তো ঠাকুরজামাই?

—কের্ত্তন! তা' শুনিয়েছিলাম বৈকি।

—তবেই বোঝা গেছে, কের্ত্তনের বায়না পাঠিয়েছে বোধহয়।

শশধর হাঁ করে তাকিযে থাকে স্ত্রীর পরিহাসদীপ্ত মুখের দিকে। আর গৌরাঙ্গ সহসা থপ্ করে দু'হাতে বাসন্তীর দু'পাযের ধুলো নিয়ে মাথায় দিয়ে বলে ওঠে—ঈস্ সাধে কি আর বলি বৌদি, বেটাছেলে হয়ে জন্মালে আপনি জজ্ ম্যাজিষ্টার হতেন। যাই দেখি সে দু'ব্যাটা ভাগলো না রইলো।

বাসন্তীও গৌরাঙ্গর পথ অনুসরণ করে বাইরের দালানের দিকে উঁকি দিতে যায়। উদ্দেশ্য মহৎ, আড়াল থেকে ওদের বাক্যালাপের সার সংগ্রহ করা। নারীজাতির একচেটে এই বিশেষ গুণটি থেকে বাসন্তীও একেবারে বঞ্চিত নয়।

ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছে বাসন্তী।

আশপাশের কোন গ্রামে কোন জমিদার গিন্নির ব্রতউদযাপন উৎসব, এই উপলক্ষে গোবর্দ্ধন অধিকারীর যাত্রার বাযনা হয়েছে, গোবদ্ধনও এদের টাকার বাহুল্য দেখে, একদিন কীর্ত্তনের আসরের ব্যবস্থা করতে প্ররোচনা দিয়ে খবর পাঠিযেছে গৌরাঙ্গকে। খামখেয়ালী গৌরাঙ্গ পাছে আসতে রাজী না হয় তাই গোবর্দ্ধনের এই নিবেট রসিকতার কৌশল।

আলোচনার সাবার্থ শুনে বাসন্তীর মনটা দমে যায়। আবার ঘরছাড়া হবে গৌরাঙ্গ? গৌরাঙ্গ থাকলে তবু সংসারে একটু প্রাণের চাঞ্চল্য জাগে, একটু হাসিখুসির হাওয়া বয়। এ মনোভাব যে একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুচিত সে বোধ বাসন্তীর নেই।

গৌরাঙ্গ বাড়ী ঢুকেই হৈ চৈ করে ওঠে—আপনার অনুমানই সত্যি বৌদি। একখুনি যেতে হবে, ওখানেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।…বাদলা উঠেছিস্ নাকি ? যাবি আমার সঙ্গে ?

—বাদলা যাবে ?

—যায় তো চলুক না। কখনো তো কোথাও যেতে পায়না আমার সঙ্গে, এ একটা আস্তানায় গিয়ে ওঠা, খাওয়া শোওয়ার অসুবিধে নেই।

সুধামুখী এ প্রস্তাবে অসুখী না হলেও মুখে বিরক্তি দেখিয়ে বলে —বাদলা আবার বড় লোকের বাড়ী যাবে কি পরে ? জামা জুতো কি আছে ওর ?

হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ—আরে বাবা আমারই বা আছে কি ? কীর্ত্তুনীর ছেলে কি আর রাজপোষাক পরে যাবে ? বৌদি, দিন তো ছেলেটাকে একটু জুৎজাৎ করে, ও আপনার ঠাকুরঝির কর্ম্ম নয়।

বাসন্তী বাদলকে কাছে টেনে সাজাতে বসে, আর বিষন্নমুখে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে সুধামুখী। প্রত্যেক বিষয়ে বৌদিকে প্রাধান্য দেওযায় মাথার মধ্যে যেন দাহ হ'তে থাকে তার। বাসন্তী বাদলকে সাজায়, খাওয়ায়, তারপর বেরোবার মুখে হেসে বলে—নতুন জায়গায় গিয়ে আমাকে ভুলে যাবি না তো বাদল ?

—ধ্যেৎ! তোমায় না কি আবার ভুলে যায় মানুষ ?—এই রায় দেয় বাদল।

—ভোলে না বুঝি ? ভালো ভালো, আসবি কবে ?

—বাবা যেদিন বলবে।

—তোর বাবার তো পথে বেরোলে আর বাড়ীর কথা মনেই থাকে না। দেখেছিস তো ?

এ প্রশ্নের উত্তরে বাদল কিছু বলার আগেই গৌরাঙ্গ স্বচ্ছন্দে সহাস্যে

বলে বসে—সেই যে বলে না বৌদি, আপন চেয়ে পর ভালো, ঘরের চেয়ে বন ভালো, আমার ভাগ্যে তাই, নেহাৎ যে ঘুরে ঘুরে আসি সে শুধু এই ছেলেটার জন্যে আর আপনার জন্যে।

ঘরের মধ্যে শশধরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, হাতটা আপনি মুঠো পাকিয়ে যায়, আর সুধামুখী ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে অকারণে একটা ঘড়া কাঁকালে করে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। বেরোবার সময় খানিকটা আক্রোশ প্রকাশ করে যায় ঝাঁপের দরজাটার ওপর।

বাসন্তীর ভাগ্যবিধাতা তার প্রতি উদাসীন, কিন্তু সুধামুখীর ভাগ্য-বিধাতা যেন নিতান্তই নিষ্ঠুর। তার নিষ্ঠুরতা দৃশ্যমান স্বামীকে কি সুধামুখী কম ভালোবাসে? এই যে গৌরাঙ্গ সামান্য একটু সাজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দেখে সুধামুখীর প্রাণটা ভরে উঠলো না কি? যাবার সময় দুটো ভালো কথার আদান প্রদান হয় এ ইচ্ছে কি ওর ছিলোনা? কিন্তু কি যে হয় সব যেন ভেস্তে যায়। আর শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর ওপর একটা তীব্র আক্রোশে মনটা রী রী করে জ্বলতে থাকে। তবু ঠিক ভাইয়ের মতো বোকা নয় সুধামুখী, যাকে সন্দেহ করা বলে তাও করে না স্বামীকে, তাই স্বামীর উপযুক্ত বিশেষণ জোগাড় করেছে ও—'বুড়োখোকা'।

কীর্ত্তনের আসরটি সাজানো হয়েছে চমৎকার।

বনেদী বড়োলোকের বিরাট চকমিলানো বাড়ী, মাঝখানের উঠোনে প্রকাণ্ড গালচে পেতে বসেছে আসর। দোতলার দালানে মহিলার আসন সংরক্ষিত, তাঁরা অনেকেই ভালো জায়গা দখল করতে ঘণ্টাচারেক আগে

থেকে এসে বসে আছেন। পুরুষজাতির 'ভালো'র জন্যে অতো কাড়াকাড়ি নেই, তাঁরা আসছেন ধীরে সুস্থে।

চারিদিকে দালানের খিলেন আর খিলেনের প্রত্যেকটি থামের গায়ে এক-খানি করে বড়ো বড়ো ছবি টাঙানো, কৃষ্ণ লীলার নানা মূর্ত্তি। সব ছবিতে ফুলের মালা ঘেরা। মাঝখানে প্রকাণ্ড এক সাবেকি ঝাড়লণ্ঠন।

আসরের মাথার দিকে জলচৌকী পেতে আর একখানি পট স্থাপন করা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। ফুলের ভারে ছবিখানি প্রায় ঢাকা। দু' পাশে ধূপদানীতে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে এক গোছা করে ধূপ। ধূপের গন্ধে আর ফুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা যেন হৃদয় ভারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

আসরের এক প্রান্তে গুটিসুটি মেরে বসেছিলো অভিভূত বাদল। ওরও হৃদয় ভারে প্রায় মূর্চ্ছিত অবস্থা!

এতো ফুল, এতো আলো, এতো শোভা! এইখানে আসতে মা বারণ করছিলো ভালো জামা জুতো নেই বলে! তুচ্ছ জুতোজামা, এই জনারণ্যে কে তাকিয়ে দেখছে বাদলের গায়ে কি জামা, বাদলের পায়ে ভালো জুতো আছে কি না।

এরপরে যখন খোলের বাদ্য উঠলো, আর গৌরাঙ্গ আসরে এসে সুর ধরলো তখন আর বাদলের বাহ্যজ্ঞান নেই। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তার বাবা! খালি গা, কপালে চন্দন মাখা, গলায় মোটা গোড়ের মালা, উড়ুনি একখানা আলতো করে গায়ে জড়ানো, হাত নাড়ার তালে তালে উড়ুনী খসে খসে পড়ছে, আবার গুটিয়ে নিয়ে গায়ে জড়াচ্ছে।

ঝাড় লণ্ঠনের সমস্ত আলোটা এসে পড়েছে গৌরাঙ্গর গায়ে, সমস্তটা মিলিয়ে যেন একটা লোকাতীত রূপ। বাপের রূপে মোহিত হয়ে যায় বাদল,

অকারণে বারে বারে তাঁর চোখে জল আসে। ওই অলৌকিক ব্যক্তি তার বাবা, এ বিশ্বাসের জোর মনের মধ্যে যেন খুঁজে পায় না। নিজেকে ভারী অকিঞ্চিতকর মনে হয় বাদলের।

তবু ঘুম এসে যায়। ···চোখ রগড়ে রগড়েও চোখকে আয়ত্তে আনতে পারে না বেচারা। মনের মধ্যে যতোই আগ্রহ আকুলতা থাক, দেহটা শিশুর বৈতো নয়, বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। পাশের ব্যক্তি বিরক্ত চিত্তে হাঁটুটা একটু সঙ্কুচিত করে শোবার মতো সামান্য জায়গা করে দেন।

গৌরাঙ্গর মধুর কণ্ঠ তখন কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে মুগ্ধ জনতার ওপর।

দোতলার দালানে আর দু'টি বিস্ফারিত দৃষ্টি বাদলের মতোই মুগ্ধ হয়ে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতময় মূর্ত্তিখানির দিকে স্থির হয়ে তাকিযে ছিলো। বোধ করি তারও বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। ···এ কি শুধু গায়ক, না স্বয়ং নদের গোরা। নাম শুনেছিলো 'গৌরাঙ্গ', নামের এমন সার্থকতা অপর্ণা কি কথনো দেখেছে ?

অপর্ণার মনের কথারই প্রতিধ্বনি উঠেছে সমগ্র নারী মণ্ডলীর মধ্যে।

'আহা-হা কী রূপ রে, যেন সত্যিকার গৌরাঙ্গ অবতার ! ···মা আছে কি না কে জানে ! ···বিয়ে হযেছে ? ···ও মা, ছেলে নিয়ে এসেছে যে। ছেলে-টুকুও থাসা, বাপের মতো রং নয়, কিন্তু মুখখানি যেন গোপালের মতো।'

সকলেই মন্তব্য প্রকাশে হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করছে, কিন্তু অপর্ণার সংকল্প আলাদা। ······একবার দেখা করা যায় না ? একবার গিয়ে নিজে মুখে প্রশংসা করা যায় না ? বলা যাব না, তোমার রূপে আর তোমার গানে কী আনন্দের সঞ্চার করেছো তুমি অপর্ণার মনে ! ···কিন্তু কেমন করে দেখা করা যাবে ?

সহরের ব্যাপার নয় যে অটোগ্রাফের খাতাখানা নিয়ে এগিয়ে যাবে। পল্লীগ্রামে এগিয়ে যাবার আর কোনো উপলক্ষ্য জোগাড় করা সম্ভব নয় এক মাত্র ধর্ম্মের নামে ছাড়া। একমাত্র এইখানেই আছে ছাড়পত্র। কিন্তু তরুণী বিধবার পক্ষে সেখানেও বাধা আছে বৈ কি।

তবু অপর্ণাব ভাবী ইচ্ছে হয় একবার শুধু দেখা করে, একবার নিজের মুখে বলে—কী সুন্দর গান করেন আপনি!

অপর্ণা গৃহিনীর বোনঝি, মাসীর ব্রত উদ্‌যাপনেব উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছে। যদিও শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক নয় যে লজ্জায় জড়োসড়ো হযে থাকতে হবে, তবু প্রস্তাবটা করাই শক্ত। ··গান শেষ হলো, হরিরলুঠ পড়লো, যাঁরা বহিরাগত তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টায় যতোগুলো সম্ভব বাতাসা সংগ্রহ করে নিয়ে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে ঠেলে তুলে নিজ নিজ পথ দেখলেন, যারা জমিদার বাড়ীর দাস দাসী কর্ম্মচারী তারা আপন আপন কাজে লেগে গেলো। গালচে গুটোনো, ঠাকুরেব চৌকী সরানো, প্রত্যেকটি থামের গা থেকে ছবিগুলি নামিয়ে যথা স্থানে রক্ষা করা—কাজ কি কম!

গৌরাঙ্গকে অধিকারীর দলের 'দোয়াব'দের সঙ্গে নিযে গেছে বারবাড়ীতে। এখানে এসেই গৌরাঙ্গ এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করে—আমার ছেলেটা?

ছেলেটা! তাই তো কোথায সে! · আসরেই বসে ছিলো তো। গালচে সতরঞ্চ তো গুটোনো হয়ে গেছে, ছেলেকে কেউ দেখেনি।

গৌরাঙ্গ চৌকীতে বসে একখানা হাত পাখা নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে স্বভাব সিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে—দেখুন কেউ আবাব নিজের মোট গুণতে ভুল কবে একটা বাড়তি নিয়ে গেলো নাতো?

হাসাহাসি হ'তে হ'তে ব্যাপারটা যখন চিন্তায় পর্য্যবসিত হয় হয, এবং মুখে মুখে খবরটা রটনা হযে গেছে, তখন ভিতর বাড়ী থেকে একজন দাসী এসে খবর দিলো একটী ঘুমন্ত ছেলেকে আসর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে,

তাকে ডেকে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বাড়ীর মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়েন মশাই যদি একবার নিজে এসে দেখে যান তো ভালো হয়।

অনেকক্ষণ ছেলেটাকে দেখেনি বটে, মনটা একটু অস্থির হয়েছে বৈ কি, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ? সে আবার এক ঝামেলা।

গৌরাঙ্গ দাসীটাকে উদ্দেশ করে বলে—কেমন দেখতে ছেলেটি, দেখে এসে বলো না, শুনলে বুঝতে পারবো।

দাসীটা বেজার মুখে বলে—বারবাড়ী থেকে ভিতর বাড়ী চোদ্দবার আনাগোনা করা কি সোজা ঠাকুর ! দু'বার হাঁটলে এক কোরশ্ রাস্তা। ক'দিন ধরে খেটে খেটে প্রাণডা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর হেঁটে হেঁটে তো পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেলো। আপনি চলো না একবার।

দাসীর পায়ের সুতো ছেঁড়ার অজুহাতে অগত্যাই গৌরাঙ্গকে অন্তঃপুরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে যেতে হয়। যদিও সে নিঃসন্দেহ যে ঘুমন্ত ছেলেটা আর কেউ নয় বাদলই। অমন বাদসাহী ঘুমটা আর কার হবে ! তবু ছেলেটাকে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে শুতে মন সরে না।

কিন্তু ওখানে গিয়ে যে এমন বিপদে পড়তে হবে তা জানলে কি গৌরাঙ্গ এ পথের ছায়া মাড়াতো ? অন্তঃপুরের অন্তর্লোক যে গৌরাঙ্গকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে একথা গৌরাঙ্গর কল্পনাতেও আসার কথা নয়।

একে কীর্তন গাইয়ে তা'তে জাতে ব্রাহ্মণ, এতে মহিলা সমাজ একবার তাকে ভক্তি নিবেদন না করে পারে কি করে। শুধু ভক্তি নিবেদন করেই ক্ষান্ত হ'বার পাত্রী মেয়েরা নয়, নৈবেদ্যও নিবেদন না করে ছাড়বেন না তাঁরা। জল খেয়ে যেতে হবে গৌরাঙ্গকে।

গৌরাঙ্গ 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' মনোভাবে বলে—জলটল আবার কেন, সে বাইরে সকলের সঙ্গে হবে। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে ঘুমোক, সকালবেলা পাঠিয়ে দেবেন ওদিকে।

কিন্তু কথা তার থাকে না। স্বয়ং কর্ত্রী এসে এবার রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেন। নিজস্ব রাশভারী চালে বলেন—খাবো না বললে কি চলে বাছা, বামুনের ছেলের ভোজনে 'না' করতে নেই। এরা সব আগ্রহ করে গুছিয়ে রেখেছে। আহা, বড়ো খাসা গান শুনিয়েছো বাছা, শুনে বড়ো তৃপ্তি পেয়েছি। ওই একটাই ছেলে বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসরে কোথায় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলো, যে যার চলে গেছে আর ছেলে একা পড়ে আছে। আমার বোন্‌ঝি ওপর দালান থেকে দেখতে পেয়ে চাকরাণীদের দিয়ে তুলিয়ে এনে শোয়ায়। কী ঘুম বাপু তোমার ছেলের, নড়ে চড়ে না। রাতের খাওয়াও হয়নি বোধহয় বাছার।

—না না সন্ধ্যাবেলায় খেয়েছে—গৌরাঙ্গ হাসে—বিকেলের যা জলখাবার পাঠিয়েছিলেন তা'তে দু'বেলার কাজ চলে যায়।

—আচ্ছা তা'হলে আর ডেকে কাজ নেই, তুমি একটু ফল জল মুখে দিয়ে যাও। চারু ঠাকুর মশাইকে নিযে যা তো।

গৃহিণীজনোচিত কর্ত্তব্য সেরে গৃহিণী প্রস্থান করেন।

গান ভালো লেগেছে বলে কীর্ত্তন গাইযেকে নিজে কাছে বসিযে খাওয়াবেন—এতোটা ব্যালেন্সের অভাব নেই তাঁর।

চারু ঝি ওকে সাজানো পাতের সামনে নিযে গিয়ে বসিযে দেয, আশে পাশে অবগুণ্ঠনবতী নারীবাহিনী। আহারের আয়োজন দেখে গৌরাঙ্গর চক্ষুস্থির। কি সর্ব্বনাশ! পুরুতবামুন না কি সে? এই রাতদুপুরে ওই ক্ষীর ছানা মাখন মিছরী ফল সরবৎ দই দুধের সম্ভার? তাই কি একটা সামঞ্জস্য আছে জন চার পাঁচেব মত আযোজন!

—মাপ কবতে হবে, এতোরাত্রে এসব—গৌরাঙ্গ পিছন ফিরতে উদ্যত হয়, কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে যে সম্মিলিত 'হাঁ হাঁ' ধ্বনি ওঠে তা'তে

থমকে দাঁড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। ওদের প্রতিবাদের ভাষাটা না বুঝলেও ভাবটা বুঝতে ভুল হয না, গৌরাঙ্গ তা'র উত্তরে বলে—বেশ এতো আয়োজন যখন করেছেন, কষ্ট করে বরং কাউকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন সকলে মিলে মিশে সদ্ব্যবহার করে ফেলা যাবে।

এবার সত্য সত্যই ফিরে দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ বাইরে বেরুবার চেষ্টায়, আর ঠিক সেই সময হঠাৎ দালানের পাশের দরজায় দাঁড়িযে থাকা মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন গায়ক ঠাকুর, বেশ তো? ছেলে চিনতে এসেছিলেন না?

ছেলে!

তাই তো বটে! এঁদের ভক্তি নিবেদনের তুফানে দিশেহারা গৌরাঙ্গর মনেই ছিলো না যে সে কি করতে এসেছিলো। অপর্ণা এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িযে ছিলো, সে যে হঠাৎ এমন বাচালতা করে বসবে এটা উপস্থিত সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিত।

কালো ফিতে পাড় শাড়ী পরণে, আঁট সাট গড়নে আঁটসাট জামা পরা মাজা ঘসা তরুণী বিধবা। বড়োলোকেব বাড়ীর বৌ, নিতান্তই ভাগ্যবিপাকে অসময়ে ভালো খাওয়া পরাব দাবী হারিয়েছে। তবু যেটুকু করলে সমাজ চোখ বাঙাবেনা, সেটুকু করবে বৈ কি। তা' ছাড়া—এটা শ্বশুব বাড়ী নয়, মাসীব বাড়ী।

গৌরাঙ্গ একবাব ওর আপাদ মস্তক দেখে নিযে বলে—ও আর দেখতে হবে না, ভালো জাযগায আশ্রয পেয়েছে সুখে নিদ্রা যাবে।

—জাযগাব ভালো মন্দে আপনার ছেলেব নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। অপর্ণা বলে।

—তা' বটে। ঘুমেব জন্যে ও বিখ্যাত।

—চলে যাচ্ছেন, একবার নিঃসন্দেহ হয়ে যান! ·· দেযালের ধারে রাখা

হ্যারিকেনটা খপ্ করে তুলে নিয়ে 'আসুন' বলে পথ দেখিয়ে ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় অপর্ণা। গৌরাঙ্গও বোধ করি অজ্ঞাতসারে তা'র অনুসরণ করে।

উপস্থিত মহিলারা মুখ চাওয়াচায়ি করেন মাত্র।

ধবধবে বিছানায় ধবধবে মশারি ফেলা, মশারির ঝালরের একটা কোণ উঁচু করে তুলে ধরতেই গৌরাঙ্গ ব্যস্ত হয়ে বলে—ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা আমি যাই।

অপর্ণা মৃদু হেসে বলে—যার জন্যে এতো বুদ্ধি খাটিয়ে আপনার ছেলেটিকে ডাকাতি করে এনে নিজের এক্তারে রাখলাম সেইটাই যে বাকী থেকে গেলো।

গৌরাঙ্গ অবাক হয়ে তাকায়।

—আপনার ঠিকানাটা যে চাই।

—আমার ঠিকানা! কি হবে তা'তে?

—আছে দরকার, আমার শ্বশুর বাড়ীতে আপনাকে একবার নিয়ে যাবো, আমারও ব্রত উদ্‌যাপন আছে।

—আমার আবার ঠিকানা! আমি—বুঝলেন কি না—ভবঘুরে মানুষ, কখন কোথায় থাকি ঠিকই থাকে না। আচ্ছা আমি—

—যাবেন যাবেন, এখানে কে আপনাকে ফাঁসি দিচ্ছে? আপনি নিজে না হয় ভবঘুরে, স্ত্রীপুত্র যখন আছে তখন নিশ্চয় স্থায়ী ঠিকানাও একটা কোথাও আছে! বলুন না।

—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকানা আমি এখানে রেখে যাবো। হঠাৎ একবার শুনলে মনে থাকবে কেন?

—বেশ আমার ঠিকানাটাই রাখুন তবে।

হাতের মুঠো থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে গৌরাঙ্গর হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দেয় অপর্ণা।

গৌরাঙ্গ নিতান্তই সংসারজ্ঞানহীন, তবু এই পরিবেশটায় ওর যেন গা ছম্ ছম্ করছিলো। এই বিরাট প্রাসাদের অন্দরমহলে ঢুকতে ওকে কতো-গুলো ঘর দালান গলিপথ অতিক্রম করতে হয়েছে তা ওর খেয়ালই নেই, দাসীটাকে অনুসরণ করে চলে এসেছে মাত্র। কে জানে এখানে ডেকে এনে এরা আর বেরোতে দেয় কি না। ও ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠে—আমাকে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দিন।

অপর্ণার চোখে মুখে একটা হাসির আভাস খেলে যায়। তারপর বোধ করি করুণাপরবশ হয়েই বলে—চলুন। ছেলেকে কিন্তু কাল সকালে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়া হবে। বামুনের ছেলে রাত উপোসী হয়ে রইলো।

আবার আর একটা ঝিয়ের পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে আসে গৌরাঙ্গ, এসে হাফ ছেড়ে বাঁচে। উঃ কী বিপদেই পড়া গিযেছিলো! নাকে কানে খৎ, বড়োলোকের বাড়ী আর নয়।

মহিলামণ্ডলীতে ফিরে এসে অপর্ণা প্রথমটা হেসে গড়িয়ে পড়ে, তার পর কিছু স্থির হযে বলে—ঠাকুর মশাই আমাদের এদিকে বেশ গোছালো আছেন। এই একদণ্ডের মধ্যেই চুপিচুপি বলা হচ্ছে কি 'আরও দু'পাঁচ জাযগায কাজ কর্ম্ম পাইযে দিন না। সংসারেব অবস্থা ভালো নয়, এই করেই রোজগার!' ·· আমি আশ্বাস দিয়েছি দু'মাস পরে আমার নিজেরই ব্রত সারা আছে, ঠিকানাটা রেখে যাবেন, মনে থাকে তো খবর পাঠাবো।

সন্দেহাকুল চিত্তগুলি বোধ করি এতোক্ষণে একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। ওঃ চুপি চুপি কথার রহস্য তবে এই!

বেলা অবধি ঘুমের আয়েসের অভ্যাস থাকলেও, অপরিচিত জায়গায় ঘুমটা ভেঙে গেলো ভোর বেলাতেই। কর্ম্মচারীদের থাকবার জায়গায় এদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কেউ কেউ ভোরেই উঠে গেছে, অনেকেই পড়ে ঘুমোচ্ছে। গৌরাঙ্গ উঠে পড়ে বাগানের দিকে বেরিযে ঘোরাফেরা করছিলো, হঠাৎ ভিতর বাড়ীর বাগানের দিকে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বাদল। উৎফুল্ল মুখে বল্লে—বাবা, বাবা, মাসীমা তোমাকে একটা জিনিশ দেবে।

- মাসীমা! মাসীমা আবার কে রে বাদল ?

—ওই যে যিনির বিছানায় শুযেছিলাম আমি।……এখুনি আমার মুখ ধোওয়া রসগোল্লা খাওযা সব হযে গেছে বাবা।

গৌরাঙ্গ হেসে ফেলে বলে—রসগোল্লা খাওযা হযে গেছে ? তাহলে তো আসল কাজটাই মিটে গেছে রে বাদল ! কিন্তু 'যিনির' বিছানায় শুয়েছিলি, তিনি আবার তোর মাসীমা হলো কখন ?

—সেই—সক্কাল বেলা। ভালো করে ফরসাই হযনি তখন। আমি তো ঘুম ভেঙে গিযে একেবারে হাঁ। তখন মাসীমা বললো 'আমি মাসীমা হই।' মাযের বোন মানে মাসী, তাই তো বাবা ?

—হুঁ। নতুন মাসীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে না রে ?

—খু—ব। আমাদের ঠিকানা কি বাবা ?

—ঠিকানা নেই। ভবঘুরের ঠিকানা থাকে না রে বাদল।

পিতৃ বাক্যে অনাস্থা করবে, বাদল এতো আধুনিক ছেলে নয়। তাই কথাটা মেনে নিয়ে বলে—আচ্ছা তাই বলবো মাসীমাকে।‥কই গেলে না বাবা ?

—কোথায় যাবো রে ?

—ওই দিকে। মাসীমা দাঁড়িয়ে আছে যে তোমায় একটা জিনিশ দেবে বলে। তুমি খুব ভালো গান গেয়েছো কি না তাই প্রাইজ।

গৌরাঙ্গ ঈষৎ দৃঢস্বরে বলে—বুড়ো ছেলে আবার প্রাইজ নেয় নাকি রে বাদল? তা' ছাড়া—পরের জিনিশ নিতে নেই।

—তবে ওই কথা বলে আসি। বলে বাদল আবার উল্টো মুখো ছুটছিলো, কিন্তু মাঝপথে থমকে দাঁড়াতে হলো তা'কে, পর্ব্বতই মহম্মদের কাছে আসছেন!

পরের জিনিশ নিতে নেই এ কথা কে বললে? পরের জিনিশ না নিতে পারলে কেউ কখনো বড়োলোক হয়? ·· সকালের আলোয় আর হাসির আলোয় প্রশ্নকারিণীর শ্যামবর্ণ মুখখানাও যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

গৌরাঙ্গ ঘাড় হেঁট করে বলে—বড়োলোক হ'বার ইচ্ছে সকলের থাকে না। বাদল ওদিকে যাবি, না এখানে থাকবি?

—এখানেই থাকবে, আর আপনি যে দুদিন থাকবেন, ও এদিকেই খাবে।

—তা' ভালো।·· খুব করে রসগোল্লা খাবি কি বলিস রে বাদল? থাক তবে এখন নতুন মাসীর কাছে।

—আঃ আপনি ভারী ছটফটে, কেবল পালাই পালাই করেন। দাঁড়ান, বড়োরা না হয় প্রাইজ নেয় না, কিন্তু ছোটোরা মাসী পিসির কাছে—উপহার নেয় তো? বাদলের আমি মাসী হয়েছি, তা'র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বাদলকে একটা জরিপাড় ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবী দেবার ইচ্ছে আমার।· এখানে কে কিনে দেয়, আপনি আমার হয়ে কিনে দেবেন!

হাত বাড়িয়ে দু'খানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দেয় অপর্ণা।

—গরীবের ছেলের জরিপাড় ধুতি পরা সাজে না।

—মাসী উপহার দিলে সাজে।

—আচ্ছা আপনি নিজেই তা'হলে সুবিধে মতো পরে পাঠিয়ে দেবেন।

বাস্থলডাঙায় শশধর ঘোষালের বাড়ী বললেই যে কেউ বাড়ী চিনিয়ে দেবে।

— আপনার আসল নাম শশধর নাকি ?

গৌরাঙ্গ হেসে ফেলে, মুক্তোর সারির মতো ঝক্‌ঝকে দাঁতের ওপর সকালের আলো যেন ঝিলিক্ মেরে ওঠে। অপর্ণার বিমুগ্ধ দৃষ্টি সে হয়তো তাকিয়ে দেখে না, আপন খেয়ালে হেসে ফেলে বলে—নাঃ ! শশধর ঘোষাল হচ্ছেন বাদল বাবুর মামা।

—টাকাটা নেবেন না ?

—নাঃ।

—বেশ ও থাক। আর একটা কথা, লোকে তো যাত্রা কীর্ত্তন শুনে খুসি হয়ে প্যালা দেয, তা' নিতে আপনার আপত্তি করলে চল্‌বে কেন ?··· অপর্ণা হঠাৎ টুক্ করে নিজের গলা থেকে সরু চেন হারটুকু খুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলে—নিন জয়মাল্য।

সর্ব্বনাশ ! এতো বিপদও তোলা ছিলো গৌরাঙ্গব কপালে ! ঘাসের মধ্যে হঠাৎ সাপ দেখলে লোকে যেমন চোঁ চোঁ দৌড় মারে গৌরাঙ্গ হঠাৎ তেমনি 'না না মাপ করবেন' বলে ফিরে দৌড় দেয়।

আরও দু'দিন থেকে আর কাজ নেই বাবা, আজই পিটটান।

ঘরে এসে বসে কিছুক্ষণ প্রায হাঁপাবার পর গৌরাঙ্গর হঠাৎ খেয়াল হয কালকের সেই ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা দেখা হয়নি। নিযে এসে আলনায় ঝোলানো জামার পকেটটায় রেখে দিয়েছিলো না ?··· তাই বটে, পকেট থেকে বার করে কাগজের পাট খুলে দেখলে লেখা রযেছে—"কখনো যদি কোনো দরকার পড়ে, এই ঠিকানায় আসবেন। অপর্ণা ঘোষ।" কাগজের ওপিঠে বর্দ্ধমানের একটা ঠিকানা।

হঠাৎ কি ভেবে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে গৌরাঙ্গ, আবার কি ভেবে সেই ছেঁড়া টুকরো চারটে ফের পকেটেই রেখে দেয়।

গোবর্দ্ধন অধিকারী ফেরার প্রস্তাব শুনে 'হায় হায়' করে বলে—চলে যাবে মানে? তোমার গান আরও দুদিন শুনবে বলে গাঁয়ের লোক 'আশ্বাস' হয়ে রয়েছে।

—শরীরটা ভালো ঠেকছে না অধিকারী মশাই।

—রাতে বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে। কসে আদা মরিচ দিয়ে খানিক চা খাও, গা ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—না অধিকারী মশাই, একবার যখন মন-মেজাজ বিগড়েছে, গান আর হবে না।

অধিকারী আর বেশী প্রতিবাদ করে না, গৌরাঙ্গকে সে চেনে। অতএব যাত্রার ব্যবস্থা। বাদল অবশ্য খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়, কারণ তার জীবনে এমন সমারোহের আস্বাদ এই প্রথম, আবার ফেরার প্রস্তাবে মনে হচ্ছে বেচারার হয়তো এই-ই শেষ। বাদলের জীবনে কি আর কখনো ঘটবে এতোগুলো জিনিশের সমাবেশ?

গরুর গাড়ীতে ওঠার পর গৌরাঙ্গ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলেকে প্রশ্ন করে—তোর বুঝি থাকতে ইচ্ছে করছিলো রে বাদল?

বাদলের অভিমান ঘনীভূত হয়ে আসে, উত্তর দেয় না।

—পরের বাড়ী বেশী দিন থাকতে নেই বুঝলি?

—আমি তো থাকতে চাইনি।

—চাসনি, ইচ্ছে করছিলো তো?

—ইচ্ছেটা তো তুমি চক্ষে দেখতে পাচ্ছো না।·· বাদল পথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে।

—চক্ষে আবার দেখতে পাচ্ছি না, খুব দেখতে পাচ্ছি। তোর মুখে লেখা

রয়েছে যে। তোর ইচ্ছে করছে—ক্ষ্যাপানোর সুরে বলতে থাকে গৌরাঙ্গ—নতুন মাগীর কাছে আরো অনেক দিন থাকি, পেট ভরে রসগোল্লা খাই, জরিপাড় ধুতি নিই, সিল্কের পাঞ্জাবী নিই—

এতো অপমান সহ্য করতে রাজী হয় না বাদল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ করে—কক্ষনো না। তা'হলে আমি মালাটা নিলাম না কেন ?

—কোন মালাটা··বিস্মিত প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গ।

যে মালাটা তোমাকে প্রাইজ দিচ্ছিলো। ওর পদকের মধ্যে মাসীর ফটক আছে। আমাকে পরিযে দিয়ে কতো সাধ্যি সাধনা, আমি নিলাম না।

–কেন, নিলি না কেন ? নিলেই পারতিস, বেশ তোর একটা সোনার হার হতো !

—ঈস্ নেবে বৈকি। নিজের বেলায় আঁটি সুঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটী। তুমি নিলে না, আমি নেবো কেন ? চালাকি করে বললাম—নিলে বাবা মেরে পিঠ ভেঙে দেবে।

—বললি এই কথা ! আমি মারি তোকে ? গৌরাঙ্গর চোখ গোল হয়ে ওঠে।

—না বললে যে ছাডছিলো না।

—তোর পিঠ ভাঙাই উচিত।

এবার রাগ করে ঘুরে বসার পালা গৌরাঙ্গব। পিতাপুত্রের এই মান-অভিমানের মাঝখানে একটা আকস্মিক ঘটনার ছেদ পড়ে। গাডী তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, দুব থেকে একটা মুনিষ ছোকরা ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ী থামায়। কি ব্যাপার !

—আপনার জন্যে আর এই খোকাব জন্যে হু'গাছা পেসাদী মালা থুয়েছিলো, তাই পেইঠে দিলো অপ্ন্যো দিদিমণি।

কলাপাতায় মোড়া হুগাছি গোড়ের মালা। টাটকা সত্ত গাঁথা।

—মালা পরবি বাদল ?

—নাঃ, এখন 'তাত' লেগে শুকিয়ে যাবে, বাড়ী গে' পরবো। কখন পৌছবো বাবা ?

—সন্ধ্যে নাগাদ।

—ওব্ বাবা !

ক্ষণপূর্ব্বের অনিচ্ছা বিস্মৃত হয়ে গেছে বাদল। এখন বাড়ী মনে পড়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। একটু পরে বলে—কাল রেতে যখন গান হচ্ছিলো বাবা, তোমাকে ঠিক যেন ছবির ঠাকুরের মতন দেখাচ্ছিল।

—দূর বলতে নেই।

—ঠিক তেমনি লাগছিলো যে। ...বাড়ীতে অতো ভালো গান গাও না কেন বাবা ?

—বাড়ীতে! হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ—বাড়ীতে গাইলে তোর মামা আর দিদিমা ধরে একেবারে পিঠ ভাঙবে।

—মারবে বৈ কি ! আমি বড়ো হলে তোমার জন্যে আরো অনেক সুন্দর করে আসর খাটিয়ে দেবো বাবা, আর রাজ্যের লোক গান শুনতে আসবে। তখন দিদিমা আর মামা বোকা হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে।

মামা ও দিদিমার ভবিষ্যত দুর্দ্দশার কল্পনায় খিল খিল করে হেসে ওঠে বাদল। কাল থেকে তা'র প্রাণের মধ্যে এমনি একটা আকুলি বিকুলিই করছে—কতো গুণ তার বাবার, কী মান্য তার বাবার, অথচ বাড়ীতে কেউ সে সব বোঝেনা। ওদের যেদিন বুঝিয়ে দিয়ে জব্দ করতে পারবে, সেইদিনই বুঝি বাদলের বড়ো হওয়া সার্থক হবে।

গৌরাঙ্গ ছেলেকে কোলের গোড়ায় টেনে বলে—দুর তা' কেন, আমাদের ভবঘুরে অপেরা পার্টি' ?

তা ও তো বটে। বাদলের যে সে কথা জানা। কল্পনা বিলাসী বাদল যে বাপের সকল গল্পের সঙ্গী। অপেরা পার্টির কোন কোন পালায় বাদলকে কি কি পার্ট দেওয়া হবে সে সম্বন্ধেও তাকে কিছু কিছু অবহিত করিয়ে রেখেছে গৌরাঙ্গ। মাঝে মাঝে ভাবী অপেরা পার্টির ভাবী অধিকারী স্টেশন মাষ্টার মশাইয়ের কাছে বেড়াতে নিয়ে যায় ছেলেকে, বাপের কড়ে আঙুল ধরে হাঁটতে হাঁটতে অম্লানবদনে ক্রোশখানেক রাস্তা পাড়ি দেয় বাদল। সেখানে তিন বয়সের তিনটি বন্ধু একটি কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করে।

অধিকারী তাঁর পালার খাতা খুলে কখনো করুণ কখনো মধুর কখনো বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে সুর করে পড়তে থাকেন, বাদল অভিভূত হয়ে শোনে।

—পার্টি কবে খুলবে বাবা?

—খুলবো খুলবো। টাকার জোগাড় হচ্ছে না যে।

—কতো টাকা লাগে বাবা?

—অনেক।

—নতুন মাসীমাদের অনেক টাকা আছে।

ছেলের মনের গতি অনুমান করে হেসে ওঠে গৌরাঙ্গ—লোকের আছে তা আমার কি রে?

বাদল লজ্জিত হয়ে চুপ করে যায়। একটু পরে বলে—গান গাওনা বাবা। বেশ হাওয়া বইছে।

গৌরাঙ্গ চকিত হয়ে বাইরের দিকে তাকায়। বেলা তিনটে নাগাদ রওনা দিয়েছিলো তা'রা, কাজেই এর মধ্যেই অপরাহ্নের আভাস লেগে গেছে আকাশে বাতাসে।

মনে মনে ভাবে···ছেলেটা ভাবুক আছে, গানেব সঙ্গে মলয় বাতাসের ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করে ফেলেছে এই বয়সেই।

—কোনটা গাইবো বল।

—তোমার যা ইচ্ছে। কালকের গানটা।

—কাল তো কতোই গাইলাম। রোস অন্য একটা নতুন গান গাই।

অভ্যস্ত মাজা গলায় গেয়ে ওঠে গৌরাঙ্গ—ভুল করে তুই কুল খোয়ালি কদম্বেরই মূলে! ও রাই কদম্বেরই মূলে। জানিসনে কণ্টক আছে ওই কদম্ব ফুলে। ভুল করে তুই—

তুলসীতলায় প্রদীপ দেবার সময় তখনো হয়নি। গ্রামে ঘরে এই সময় গৃহস্থের মেয়েরা তুলসীতলা নিকোয়, বাড়ীর সব দরজার চৌকাঠে জলছড়া দেয়, যারা গরু বাছুর চরতে পাঠিয়েছে তা'রা ছেলে পুলেকে ডাকার মতোই নিজস্ব ভঙ্গীতে আপন আপন গরু বাছুরের নাম করে উচ্চস্বরে ডাক দিতে থাকে, আর বয়স্থা গৃহিনীরা 'ঠাকুর দোরে' গিয়ে বসেন জপের মালা হাতে।

এই সময় গরুর গাড়ীটা এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো।

বাসন্তী তখন সদর কপাটে জলছড়া দিতে এসেছে। বাদলকে নামতে দেখেই উল্লসিত হযে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ওমা, বাদল সোনা—আজই এসে গেলি? এই যে শুনলাম তিন চার দিন থাকবি। আয় আয়, এতো খানি রাস্তা গোরুর গাড়ীতে আসা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। ···কি ঠাকুর জামাই, বড়োমানুষের বাড়া বুঝি মন টে'কলোনা?

—ঠিক বলেছেন। সাধে কি আর বলি আমাকে শুধু আপনিই বুঝেছেন।···হেসে ওঠে হু'জনেই।

শশধর তখন ঘরের মধ্যে সন্ধ্যাআহ্নিকের উদ্যোগ আয়োজন করছে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, কার আগমনে বাসন্তীর এমন কলকাকলী।

ওঃ ঠাকুরজামাই! তাই!

রাগে হাত পা কাঁপতে থাকে শশধরের।

ইত্যবসরে ওরা নেমেছে।

সুধামুখী কোনোদিনই এ সময় পাড়া বেড়িয়ে ফেরে না, নিভাননী এইমাত্র বেরিয়েছেন জপের মালা নিয়ে।

বাদল গাড়ী থেকে নেমেই আর কিছু না পেয়ে পাতায় মোড়া ফুলের মালা দু'গাছা তুলে দেয় বাসন্তীর হাতে। বাসন্তী বাঁধনটা খুলতে খুলতে বলে—কিরে বাদল ফুল নাকি?

—ফুল নয়, মালা। একটা আমার একটা বাবার! বাড়ী এসে পরবো বলে বাঁধন খুলিনি।

—তাই বুঝি? বড়োলোকরা শুধু ফুলের মালাতেই 'বিদেয়' সারলো নাকি ঠাকুর জামাই? বাসন্তী হাসতে হাসতে একটা মালা বাদলের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে—বাঃ ভারী সুন্দর মালা তো, কেমন দেখাচ্ছে দেখো ঠাকুর জামাই, যেন যশোদার গোপাল! মাথায় চুড়ো হাতে বাঁশী ধরিয়ে দিলেই হয়।

—ধ্যেৎ।··· লজ্জিত প্রতিবাদ করে বাদল ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেকে দেখতে থাকে।

বাকী মালাটা হাতে নিয়ে গৌরাঙ্গর দিকে এগিয়ে ধরে বাসন্তী বলে—এই নাও মশাই তোমার ভাগ। পরো না একবার, কলির গৌরাঙ্গ দেখে চক্ষু সার্থক করি।

নেহাৎই সহজ পরিহাস, কিন্তু নির্বোধ গৌরাঙ্গ একটা বেয়াড়া কাণ্ড করে বসে, মালাগাছটা বাসন্তীর হাত থেকে নিয়ে থপ্ করে বাসন্তীর গলাতেই পরিয়ে দিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে দুই হাত উল্টিয়ে সুর করে গেয়ে ওঠে—মালা

নয় সখী মালা নয় এ যে আমার হৃদয় জ্বালা !··· এ কাঠখোট্টা গলায় কি আর ফুলের মালা মানায় বৌদি !

সহসা ঘটনাস্থলে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

একেবারে মূর্তিমান বোমা ! শশধর।

—ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি ? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী না তাড়িখানা ?

এমন মুখোমুখি আক্রমণ কোনোদিন করে না শশধর। কিন্তু এমন নির্জলা বোকামীই বা কবে করেছে গৌরাঙ্গ ?

ঘাবড়ে গিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গৌরাঙ্গ, মালাগাছটা খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যায় বাসন্তী।

একটু পরে শুকনো মুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে গৌরাঙ্গ ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে—ইস্টিশন যাবি বাদল ?

বাদল নীরবে মাথা নাড়ে। ঘাবড়ে সেও গেছে।

গৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই জ্যোৎস্না নেমেছে, তিথিটা বোধহয় শুক্ল পক্ষের।··· নদীর ধার দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চলতে থাকে গৌরাঙ্গ। ভাবতে থাকে—

শশধর কেন এমন উগ্রচণ্ডা ! কী লাভ হয় মানুষের নিজেকে অপরের কাছে এমন ভীতিকর করে রাখতে ! কী ক্ষতি যদি মানুষ হেসে খেলে গান গেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয় ! দুঃখ হয় বাসন্তীর জন্যে। শশধরের এই রূঢ়তার জন্যেই বোধকরি বাসন্তীর প্রতি গৌরাঙ্গর সশ্রদ্ধ প্রীতির সঙ্গে মিশে আছে একটি কোমল মমতা। বাসন্তীকে একটু হাসাতে পারলে মনে করে

বুঝি একটু সান্ত্বনা দেওয়া হলো তাঁকে। বুঝতে পারে না সেই চেষ্টাটাই শশধরের ভিতরের বারুদ তাতিয়ে তুলতে অধিক সাহায্য করে।

গাছের পাতায় পাতায় আলোর ঝিলিমিলি· সমস্ত পথ ঘাট মাঠের উপর জ্যোৎস্নার চাদর পাতা পৃথিবীর ওপর এ যেন বিধাতার অকৃপণ আশীর্ব্বাদ।

এই পৃথিবী, এই আলো, এই বাতাস—এর মাঝখানে বাস করেও মানুষ কেন হৃদযের স্থৈর্য্য খুঁজে পায় না, কেন এই আনন্দলোক থেকে স্বেচ্ছায নিজেকে দেয় নির্ব্বাসন দণ্ড!

মানুষ যদি একটু কম রূঢ় হতো!

অবোধ গৌরাঙ্গ জানে না, বুদ্ধির সঙ্গে আনন্দের সপত্ন্য-সম্বন্ধ। মানুষ যত বুদ্ধিমান হযে উঠবে ততো নিরানন্দ হযে যাবে, আর ততো উগ্র রূঢ় হযে উঠতে থাকবে।

আগে বিরোধ হতো রাজ্যে রাজ্যে, এখন প্রত্যেকটী মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটী মানুষেব বিরোধ, প্রত্যেকটী মতের সঙ্গে প্রত্যেকটী মতেব বিবোধ। যে মানুষ আপন হৃদযের ঐশ্বর্য্য দিয়ে জগতের কল্যাণ কামনা করতে নেমেছে, সেও অপরের কল্যাণবুদ্ধিকে সহ্য কববে না, হিংসা কববে বিরোধ বাধাবে। ·কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে কল্যাণবুদ্ধির সংঘর্ষে পৃথিবীতে জ্বল্বে আগুন।)

স্টেশন মাষ্টারেব খুব্রি থেকে বেরিয়ে আসেন প্রবীণ মাষ্টারদা, উচ্ছসিত আনন্দে প্রায় আলিঙ্গন করেই বসেন নবীন বন্ধুটীকে।

—এসো এসো ! আজই ফিরলে তা'হলে ! বেশ করেছো বেশ করেছো। তিন চারটে দিন একা থাকতে হবে ভেবে আমার তো ভাবনাই ধরে গিয়েছিলো।···এই সম্প্রতি দশদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলে। তারপর কেমন দেখলে ? আমাদের 'ভবঘুরের' জন্যে জমি টমি তৈরী করে আসতে পারলে ? লোকগুলো সমজদার বলে মনে হলো ?

—সমজদার বলে, দারুণ সমজদার মাষ্টারদা ! কেউ কেউ আবার এমন সমজদার যে একবার গান শুনে গলার হার খুলে দিতে আসে।

—গলার হার ! মেয়ে লোক না কি !

—তবে আবার কি ! বাড়ীর ভেতর ডেকে নিযে বলে—তোমার ঠিকানা দাও, আমার ঠিকানায় দেখা কোরো। বলে—তোমাব ছেলের আমি মাসী হয়েছি তার জামা কাপড় কিনতে টাকা নাও, তোমার গান শুনে আমি খুসি হয়েছি, আমার গলার হার প্যালা নাও—সে এক সাংঘাতিক ব্যাপাব ! ঘাবড়ে মাবড়ে গিয়ে আমি তো মাষ্টারদা, ফিরে দৌড়।

—বয়স কম বুঝি মেযেটাব ?

—কম? মোটেই কম নয়! অপরাধিনীর অপরাধের গুরুত্ব বোঝাতে গৌরাঙ্গ জোর দিযে বলে কম বযেস হলে তো বুঝতাম বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি, কোন্ না বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস হবে।

মাষ্টারবাবু যতোই ভবিষ্যত স্বপ্নে বিভোব হোন আর অজ্ঞাত যাত্রাপার্টির জন্য পালা লিখুন, তবু গৌরাঙ্গর চাইতে একটু বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন, তাই তাঁর এক বুড়ি কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁকে সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা দেয়। অতঃপর একটু ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করেন—বিধবা মেয়ে বুঝি ?

—বিধবা ! অতো শতো জানি না, বিধবা কি সধবা তা' কি করে বুঝবো ? ভযেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছলো।

মাষ্টারবাবু ওর পিঠে 'সাবাস' সূচক একটি থাবড়া মেরে বলে ওঠেন—বেশ

করেছিস পালিয়ে এসেছিস। ও সব মেয়েছেলে বড়ো সর্ব্বনেশে।

—যাক গে মরুকগে, 'পালার' কি হলো? সেদিন তো শোনালেন না, আজকে হোক না খানিক।

—সে থাক, সে তেমন ভালো হয়নি, এখনো অনেক কাটকুট করতে হবে।

নিজস্ব নিয়মে উদগ্র আগ্রহ চেপে নিস্পৃহতার ভান দেখান মাষ্টারবাবু।

কিন্তু গৌরাঙ্গ ছাড়ে না। নিজের আর আজকে গানেব মেজাজ নেই তার। তা'র চাইতে পালা শোনাই ভালো। অবশ্য বেশী অনুরোধ করতে হয় না, কোণ ফুটো করে দড়ি বাঁধা জাব্দা হিসেবেব খাতার মতো পালাব খাতা বাব করে গুছিয়ে বসেন মাষ্টারবাবু। একটু কেসে একটু নড়ে চড়ে সুরু কবেন— "রামের বনবাস যাত্রা কালে লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা"! এই একটা নতুন দৃশ্য জুড়-লাম বুঝলি? এটা কেউ করে না, বাল্মীকী থেকে সুর কবে যতো লিখিয়ে সবাইয়েরই দেখি সীতাকে নিযে নাচানাচি। উর্ম্মিলার চরিত্রটাই কি সোজা রে? এখানে লক্ষ্মণ উর্ম্মিলাব কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। বলছেন—

অয়ি ববাননে, প্রাণাধিকা প্রেযসী আমার
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে দেহ লো বিদায
পিতৃসত্য রক্ষা তবে যাব বনবাসে।

উর্ম্মিলার উক্তি—

পরম পণ্ডিত তুমি রঘুবংশধর
বলো না মূঢের মতো কথা।
পিতৃসত্য রক্ষা তবে রাম যেতেছেন বনে
তুমি যাইতেছো সাথে ক্রীতদাস সম।
রাজাব নন্দিনী সীতা চির আদরিণী,
বনবাসে পাছে তাঁর

হয় কোনো ক্লেশ, শঙ্কা জাগে
বন্য পশু হেরি, তাই তুমি যাইতেছো
সশস্ত্র প্রহরী, অধম সেবক হয়ে।

পড়তে পড়তে মুখ তুলে তাকান মাষ্টার, আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলেন—মন্দ হচ্ছে না কি বল ?

—মন্দ ? অভিভূত গৌরাঙ্গ প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলে—ফার্ষ্ট ক্লাস হচ্ছে। কি করে যে লেখেন, তাই অবাক্ হয়ে ভাবি। কোথা থেকেই বা ভাব আসে, কোথা থেকেই বা কথা জোগায় !

মাষ্টার পরিতৃপ্তের হাসি হাসেন। তারপর বলেন—তুই যখন গান গাস আমিও তখন ওই কথাই ভাবিরে—কি করে এমন গলা খেলাস!···কিন্তু কথা হচ্ছে—উর্ম্মিলা সাজানো যায় এমন একটী ছেলে কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি ?

যেন আর সবই তৈরী, সুধু উর্ম্মিলার অভাবেই দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গৌরাঙ্গও চিন্তিত ভাবে বলে—সেই তো কথা। পার্টটা ছোট বটে কিন্তু শক্ত আছে। গাঁয়ে তো এমন একটা ছেলে দেখি না যার একটু বুদ্ধি সুদ্ধির বালাই আছে।

অর্থাৎ সে বালাই গৌরাঙ্গর নিজের যথেষ্ঠ পরিমাণেই আছে, কেবল গ্রামের ছেলেদের মধ্যেই অভাব।

আবার নিজেই সে আশ্বাস দিয়ে বলে—আচ্ছা সে এক রকম করে হয়ে যাবে এখন দৃশ্যটা শেষ করুন।

—হ্যাঁ। কি হলো—ও, এবার লক্ষ্মণ বলছেন—

—বৃথা ভর্ৎস প্রাণাধিকে, বৃথা করো তিরস্কার।
জন্মিবার আগে আপন জননী মোর
লিখে দিল ভালে, আজন্মের দাস খৎ।

একশো বছর আগের ভাষায় লিখিত এই 'রাম বনবাস' পালাকে অবলম্বন করে স্বপ্নসৌধ গঠিত হতে থাকে।

এ যুগে যে পরমাণু বোমাও সেকেলে হয়ে গিয়েছে সে বার্ত্তা ওদের কাছে পৌঁছয়নি।

আকাশে অন্ধকার থাকতে কল্কেফুলগাছের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো বাসন্তী। ভোরে সে ওঠে বটে, কিন্তু এতো ভোরে কেনোদিন ওঠে না। কিন্তু আজ কেন?

শিউলী ফোটার সময় যেমন গ্রামের বালিকাবৃন্দ রাত্রিশেষ হ'বার অপেক্ষা না রেখে গাছতলায় এসে হানা দেয়, তেমনি ছেলেমানুষীর বশেই কি গাছতলায় ঘুরছে বাসন্তী ফুল সংগ্রহের আশায়? কল্কেফল থেকে কি কাপড় ছোপাবার রং তৈরী হয়?

না কি পূজার ফুল তুলতেই এসেছে সে?

নাঃ, পুজোর ফুল তুলতে নয়, বাসন্তী এসেছে মুক্তির সন্ধানে। সংগ্রহ করতে এসেছে মৃত্যুর বিষ। ফুল নয় ফল। কল্কে ফলের বীজ বেটে খেলে নাকি অবধারিত মৃত্যু। আর মৃত্যু মানেই তো মুক্তি।

তবে?

মুক্তি যদি হাতের মুঠোয়, তবে অহরহ কেন সহ্য করা এই নাগপাশের বন্ধন যন্ত্রনা? আলো ফোটেনি, হাতের আন্দাজে গাছতলায শুকনো পাতার ওপর পড়ে থাকা ফলগুলো কুড়োতে কুড়োতে ভাবে···আশ্চর্য্য! মুক্তির এমন সহজ উপাযটা তার এতোদিন মনে পড়েনি কেন? কেন এতোদিন ধরে বেঁচে থেকে যম-যন্ত্রনা সহ্য করেছে?

বাসন্তী জানে না এটা বিধাতার দেওয়া বিভ্রান্তি। যথাযথ সময়ে যদি মুক্তির অমন সহজ উপায়টা মনে পড়ে যেতো মানুষের, তা'হলে লীলাময় বিধাতার লীলাখেলা ফুরিয়ে যেতে দেরী হ'তো না।

হাতের মুঠোয় মুক্তি নিয়েও মানুষ কাঁদবে, ছটফট করবে, মাথা খুঁড়বে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, এই নিয়ম। এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারই চলে আস্‌ছে নিরবধি কাল।

যাক, আজ বাসন্তীর বিভ্রান্তি ঘুচেছে, আজ সে মুক্তিমন্ত্র আবিষ্কার করেছে। সে মন্ত্র আর কিছু নয় কল্কে ফুলের বীজ!

কিন্তু একথা কেউ কোনোদিন বলে দেয়নি বাসন্তীকে, ঠিক কতোগুলো ফল সংগ্রহ করতে পারলে অবধারিত ফল পাওয়া যায়। কে জানে এক কুড়ি ফল বেটে খেতে গেলেই বা খাওয়ার উপায়টা কি। মরতে যাচ্ছে বলেই যে অখাদ্য জিনিষটা অক্লেশে তারিয়ে তারিয়ে খাবে, সেই বা কেমন করে সম্ভব? যাই হোক, লোকচক্ষুর অগোচরে জিনিশগুলো তো জোগাড় হোক, তারপর দেখা যাবে।

মোট কথা আজ সে মরবেই। দেখিয়ে দেবে শশধরকে, শশধরের মুঠো ফস্কে পালিয়ে যাবার বুদ্ধি বাসন্তীর আছে। দেখিয়ে দেবে সতী মেয়ে কা'কে বলে।

উঃ শশধরের গত রাত্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতার জ্বালা এখনো বোধকরি বাসন্তীর শুধু মনে নয় দেহেও দাহ ছড়াচ্ছে। রাত্রিশেষের এই স্নিগ্ধ বাতাসেও সে জ্বালার লাঘব হলো না। কাল প্রায় অর্দ্ধেক রাত ধরে শশধর বৌকে বাক্য যন্ত্রনায় জর্জরিত করে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছে—বাসন্তীর স্বভাবের সমস্ত লক্ষণগুলিই সতীমেয়ের বিপরীত এবং রায় দিয়েছে বাসন্তী

যতোই সরলতার ভান করে নিজের অপরাধ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুক, বাসন্তীকে সে বিশ্বাস করে না। শুধু তাই নয়, এও বলেছে—পরপুরুষের হাতের মালা যে মেয়েমানুষের গলায় উঠেছে, তা'র জাতধর্ম্ম সতীধর্ম্ম সবই যে শিকেয় উঠেছে একথা কচি ছেলেটাও জানে।

তবে ?

এরপর আর বেঁচে থাকার কেনো মানে হয় বাসন্তীর ?

কুড়োতে কুড়োতে আঁচল ভরে ওঠে। ফলগুলো সমেত আঁচলটায় একটা পাক দিয়ে হাত বুলিয়ে দেখে নেয় কতোগুলো হলো।······নাঃ মন্দ নয, বেশ আঁচল ভর্ত্তি হয়েছে, এতেই বোধহয় কাজ হয়ে যাবে।

বাগানের পাশেই পুকুর। পিতামহের আমলে একসময় 'মানুষের মতো' করেই ঘাট বাঁধানো ছিলো, এখন কয়েকটা পৈঁঠায় তার ধ্বংসাবশেষ-টুকু আছে মাত্র। তারই একটা পৈঠায় এসে বসলো বাসন্তী।

পাখীর কলকাকলী সুরু হয়ে গেছে····· পূবের গায়ে অরুণের আভাস দেখা দিয়েছে, একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। বাসন্তীর জীবনের এই শেষ সূর্য্যোদয়। কাল সকালের সূর্য্যোদয় আর বাসন্তী দেখতে পাবে না।

হঠাৎ যেন বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক অশ্রু উপচে পড়ে বাসন্তীর উজ্জ্বল কালো দুটী চোখের কোল বেয়ে।

পৃথিবীতে এতো আলো, এতো সুর, এতো শোভা, এ সবের উপর আর কোনো দাবী থাকবে না তা'র! বাসন্তীর জীবন থেকে এ সবই ফুরোলো!

এই ভাঙা ঘাটটা কি কোনোদিন মনে করবে—রোজ বাসন্তী ওর সিঁড়িতে এসে বসতো ? এই আগাছার জঙ্গালে ভরা বাগানটা কি কোনো

দিন খেয়াল করবে ওর বুকে ঝরে পড়া শুকনো পাতার রাশির উপর বিচিত্র শব্দের ব্যঞ্জনা তুলে দিনান্তে শতবার আনাগোনা কল্পতো বাসন্তী সংসারের অসংখ্য প্রয়োজনে ?···আর···আর·· ওই বিরাট দেহ কল্কে গাছটা ?···ও কি কোনোদিনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না ? আক্ষেপ করে ভাববে না তা'র কাছে যদি জমানো না থাকতো অবধারিত মৃত্যুবিষ তা'হলে হয়তো বাসন্তী আরো কিছু দিন এই পৃথিবীতে—

আর ভাবতে পারে না বাসন্তী, চোখের জলের স্রোতে তার চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়··· নিজের মৃত্যুশোকে নিজেই কাঁদতে থাকে সে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে।

হায় ! শশধর এতো নিষ্ঠুর কেন ?

কিন্তু শশধরই বা নিষ্ঠুর হবে না কেন ? দৈবও যে তা'র সঙ্গে অহরহই কারসাজি করছে। নইলে এই ভোর বেলা যখন কাক পক্ষী ভালো করে ওঠেনি, তখন গৌরাঙ্গরই বা কী দরকার পড়েছিল ঘাটে আসবার ?

'দৈবাতে'র এ আবার কেমন খেলা ?

অদ্ভুতই বটে। মাত্র কাল গৌরাঙ্গ তা'র মাষ্টারদা'র কাছে শুনে এসেছে প্রাতঃস্নানে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, আজই তা'র স্বাস্থ্য ভালো করবার তাগিদে ঘুম হচ্ছিলো না ?

কাছ বরাবর এসেই গৌরাঙ্গ থমকে দাঁড়ালো···এখন আর আলোর এমন অভাব নেই যে মানুষ চিনতে ভুল হবে।

বাসন্তী ঘাটে বসে কাঁদছে, এ আবার কি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। কে জানে সহজবুদ্ধি লোক হ'লে কি করতো ! হয়তো ফিরেই যেতো, হয়তো স্বামী স্ত্রীর মান অভিমানের বহর অনুমান করে মনে মনে হাসতো, কিন্তু

গৌরাঙ্গর কথা আলাদা। ও সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়িয়ে থেকেই দ্রুতপদে কাছে এসে বলে— এ কী [redacted] কী হলো ? হঠাৎ ভোর রাত্তিরে উঠে এসে ঘাটে বসে কাঁদছেন যে ? দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

বলাবাহুল্য এই সহৃদয় প্রশ্নে বাসন্তীর কান্নার বহরটাই বেড়ে যায়, তবু মনে মনে একটু আশ্চর্য্য না হয়েও পারে না। এসময় তো কোনোদিন গৌরাঙ্গ স্নানে আসে না। ···আবার না শশুরেব চোখেই পড়ে।

—কী মুস্কিল, কী হলো আপনার ? কেঁদে যে পুকুরের জল বাড়িয়ে দিলেন !

এবার বাসন্তী চোখ মোছে, মুখ ফিরিয়ে বলে—দিলাম তো তোমার কি ? কাঁদছি আমার খুসি।

—ভালো ! খুসিতে যে মানুষ কেঁদে ভাসায় এই প্রথম দেখছি। রাতে খুব ঝগড়া করেছেন বুঝি ?

—ঝগড়া ? ঝগড়া করতে আমাকে কোনোদিন দেখেছো ?···বাসন্তী নিজের স্বভাবে ফিরে এসে ঝঙ্কার দিয়ে বলে।

—আহা ঝগড়া মানে আর কি, হয়ে—বুঝছেন না, মানে দাদা বোধহয় ঠেসে বাক্যমাধুরী বর্ষণ করেছে। সত্য দুটি ভাইবোন যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ! কি বলেন বৌদি ? বিধাতা পুরুষের ভাঁড়ারে যতো মধু ছিলো সবটকু নিঃশেষ করে বোধ হয় এই দুটি ভাই বোনের জিভে ঢেলে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলো, তাই না ? আপনার কি মনে হয় ?

আপন রসিকতায় হাসিতে ফেটে পড়ে গৌরাঙ্গ।

—হয়েছে হয়েছে, আর হাসতে হবে না, তোমার এই হাসিই সর্ব্বনাশী। —বোধ করি আতঙ্কেই উঠে দাঁড়ায় বাসন্তী।

— ব্যস ! হাসির আবার কি অপরাধ হলো ? হাসবো না তো কি এবাড়ীর মতো গোমড়া মুখের চাষ করবো ? হাসলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে বুঝলেন ?

···এই যাঃ সুর্য্যি উঠে যাচ্ছে, যার জন্যে আসা তাই ভুলে মেরে দিচ্ছি। ভুলবো না ? এসেই যা ব্যাপার দেখলাম! মাষ্টারদা বলে দিয়েছে প্রাতঃস্নান করতে, অনুদয় স্নান। তা'তে না কি স্বাস্থ্য ভালো থাকে—মগজ পরিষ্কার হয়, চোখের জ্যোতি বাড়ে—

ফিক্ করে হেসে ফেলে বাসন্তী বলে—গরু হারালে গরু পাওয়া যায়—

—যাক বাবা, মেঘটা কিছু কাটলো। ...আসলে কতো দুর হয় কে জানে, ওঁর কথাটা তো অমান্য করতে পারি না! ·· এক মুঠো মাটি গায়ে ঘসে সাতটি ডুব ব্যস! · আরে আরে ও কি? আঁচলে কি ছিলো পড়ে গেলো যে। সকালবেলা পেয়ারা কুড়োতে এসেছিলেন না কি ?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বাসন্তী কর্ত্তব্য বোধ হারিয়েও বোধ করি অজ্ঞাতসারে পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়া ফলগুলো পায়ের ঠেলায় জলে ফেলে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু ফেলতে আর ক'টা পারে! কমগুলি তো কুড়োয়নি!

গৌরাঙ্গ হতচকিত হয়ে বলে—কল্কেফল! ব্যাপার কি বলুন তো ? এতে কি হবে ?

হাতে নাতে ধরা পড়লেই মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, বাসন্তীও মরীয়া সুরে বলে—এতে কি হয় জানো না ? বেটে খেয়ে নিলে আর কখনো কিছু খেতে হয় না।

—তার মানে মরণের ফিকির খুঁজতে এসেছেন!

—এসেছিই তো। বেঁচে আমার কি হবে। মরবোই তো একশোবার মরবো।

—না না, একবার মরলে, বাকী নিরেনব্বইবার আর কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু দেখছি দাদা তো অন্যায় শাসন করে না, কী সাংঘাতিক মেয়ে আপনি! আত্মহত্যের মতলব! ছি ছি ছি আত্মঘাতী হওয়া জগতের সব সেরা পাপ তা' জানেন ?

—হোক, বাসন্তী ঝঙ্কার দিয়ে বলে—ওর হাত এড়িয়ে বাঁচবো তো? তারপর নরকে পচে মরি তাও ভালো।

গৌরাঙ্গ দুশ্চিন্তাগ্রস্তের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে—না না, ভালো নয়, এ সব কথা মোটে ভালো নয়! আমি আপনাকে একটু বুদ্ধিমতী বলে ভাবতাম, এই আপনার বুদ্ধির ছিরি! দাদাকে আপনি চিনতে পারলেন না। দাদার মুখটা খারাপ, কিন্তু লোকটা ভালো বৌদি, লোকটা ভালো।

—ছাই ভালো! মনের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ্। জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। মরে ওকে জব্দ করে যাবো আমি।

গৌরাঙ্গ ক্ষুব্ধ ভাবে বলে—ছি ছি। যা খুসি বললেই হলো? চলুন আপনাকে গ্রেপ্তার করে দাদার কাছে নিযে যাই, দাদাকে সাবধান করে দিয়ে আসি।

বাসন্তী আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না, এতোদিন ধরে যে রূঢ় সত্যটা আড়াল করে এসেছে এই অবোধ লোকটার কাছে, সেইটাই প্রকাশ করে বসে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তবে আর কি, তা হলেই দাদা তোমাকে পরম হিতৈষী বলে গলা ধরে নাচবে। ওর মনের প্যাঁচের খবর রাখবার মতন বুদ্ধি তো আর তোমার ঘটে নেই। ও তোমাকে সন্দেহ করে, বুঝলে?

—সন্দেহ! কিসের সন্দেহ?

—হায় কপাল! তাও বোঝোনা? সাধে কি আর ওর ওপর রাগ করে আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছে হয়? আমরা সব খারাপ, খুব খারাপ বুঝলে? তোমার স্বভাব খারাপ, আমার স্বভাব খারাপ—

—বটে বটে! এই সব বলে নাকি? হুঁ এইবারে বুঝেছি, কেন দাদা দিন দিন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে! আমি ভাবি অম্বলে। তা' নয়, সন্দেহ! অম্বলের চাইতেও খারাপ। দেহকে একেবারে জীর্ণ করে দেয়।

ওই জিনিশটাকে দাদার মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করুন বৌদি, নইলে রোগে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

বাসন্তী কাঁদবে না হাস্‌বে!

তবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—সেই চেষ্টাই তো করতে এসেছিলাম, আজই যে তোমার প্রাতঃস্নান না করলে চলছিলো না! ওর সন্দেহের গোড়ায় একেবারে জন্মের শোধ কোপ বসিয়ে দিতাম আমি।

গৌরাঙ্গ কিন্তু গম্ভীরভাবে বলে—ওটা তো কোনো কাজের কথা হলো না বৌদি, দাদার এ রোগের একটা প্রতিকার করা দরকার।

—প্রতিকার! আমি থাকতে নয়।

—দাঁড়ান দাঁড়ান হয়েছে।… শুনছি আসছে কাল অবধি নাকি নর-নারায়ণ থাকবেন, তারপর জিয়াগঞ্জের মেলায় চলে যাবেন। ওখানে একবার গণনা করিয়ে জানতে পারলে হতো, দাদার মেজাজটা আর বুদ্ধি-সুদ্ধিগুলো কখনো ভালো হবে কি না।

বাসন্তী আশান্বিত হৃদয়ে বলে—তোমার বিশ্বাস হয় ঠাকুরজামাই?

—বিশ্বাস অবিশ্বাস বুঝি না বৌদি, দশজনে যখন মানছে তখন থাকতেও পারে কিছু। আমিই কি এতো সবসেরা বুদ্ধিমান?… দেখিই না গুণিয়ে!

হঠাৎ বাসন্তী আগ্রহে উত্তেজনায় ওর হাতটা চেপে ধরে বলে—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো ঠাকুরজামাই?

—আপনাকে? দাদা যেতে দেবে?

—দেবে না বলেই তো তোমায় বলছি। পারো তো বলি বাহাদুর।

—তাই তো! আচ্ছা দাঁড়ান ফন্দী খুঁজি একটা। … ওঃ এখন আর পরামর্শ এগোবে না, ওই যে আসছেন দাদার বোন, সুধামুখী। ওঁরও তো ভেতরে অমৃতির পাক কিনা, আপনাকে কি কম হিংসে করে!… আপনি যদি বেটাছেলে হ'তেন বৌদি, কোনো বালাই থাকতো না। তোফা বন্ধুত্ব

হ'তো। ··· কি সুধামুখী, সকালবেলা উঠেই পতি দেবতাকে দেখতে না পেয়ে দিশেহারা হ'যে বেড়াচ্ছো ?

বিষতিক্ত দৃষ্টিতে একবার ছ'টো মানুষের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সুধা মুখ ঘুরিয়ে ঘাটে নামতে নামতে বলে—কে যে কার জন্যে দিশেহারা হ'য়ে বেড়ায়, সে অন্তর্যামীই জানছে। কোন্ লজ্জায় যে লোকে হাসে তাই ভাবি।

সুধা শশধরের মতো এদের ছ'জনের প্রতি ঠিক সন্দেহভাব পোষণ করে না, হয়তো বা করতে সাহসও করে না, কারণ বাসন্তীকে সে মনে মনে যথেষ্ঠ সমীহ না করে পারে না, তবে ক্রুদ্ধ একটা মনোভাব তার আছে। প্রতি পদে নিজেকে অযোগ্য ভাবতে হ'লে যে ঈর্ষা আসে যোগ্যতরদের উপর, সেই ঈর্ষার দাহে এক তিল শান্তি নেই সুধার।

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্।

মেলাতলায ডুগ্‌ডুগিব বাদ্যি বাজছে ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্। বাদলেব হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো গৌরাঙ্গ ভীড়ের মধ্যে। জযচণ্ডীর পূজোপার্ব্বণ তিন দিনে মেটে, তবে মেলার বাজার ভাঙতে দিন পনেরো যায়। দোকান বাজারের সাজ সজ্জার বাহারটা এখন কমেছে, কিন্তু ক্রেতার ভীড় বেড়েছে। ভাঙা মেলায় জিনিশের দর নামে। এমনকি স্বয়ং নারায়ণেরও দর নেমেছে, এখন দর্শনী এক আনা, আর ভূত ভবিষ্যৎ ছ'আনা। এমনকি সুপুরি সরবরাহেরও ভার নিয়েছে কর্ত্তৃপক্ষই। অবশ্য তা'তে তাদের বেগ পেতে হচ্ছে না, এই ক'দিনে গণনা-পিযাসীদেব 'সংকল্প সুপুবি' জমতে জমতে বস্তা বোঝাই হযে গেছে তাদের। এক পয়সা মূল্য ধরে নিযে সরবরাহ করলে লাভ বৈ লোকসান নেই।

তাঁবুব কানাতের কাছে পর্দা ফেলা একটু ঘেরা জায়গা, তার মধ্যে

সুপুরি হাতে পূর্ব্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গ—হামকো যো বাসনা হ্যায় ও মিটতা হ্যায় ?

তাঁবুর ভিতর থেকে প্রথমে একটা 'হুম্ হুম্' আওয়াজ আসে, তারপর ঈষৎ সানুনাসিক স্বরে উচ্চারিত হয—"জরুর মিটতা হ্যায়, লেকিন্ কুছ্ থোড়া দের হোতা হ্যায়।"

কতকটা সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের মতলবেই এসেছিলো গৌরাঙ্গ, তবে অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে নয়, 'বিশ্বাস করবো' এই ভাব নিয়ে। এ উত্তরে তার বুকের ভিতর উদ্বেল হয়ে ওঠে, 'ভবঘুরে অপেরা পার্টি' তবে অনিশ্চিত নয। কিন্তু 'কুছ্ থোড়া' বলতে কতোটা কি বোঝায় ?

—কুছ্ থোড়া বলতে কি বোঝায় ঠাকুর ?

উত্তর আসে না।

বাঙলা কথার উত্তর দেন না নারায়ণ।

—বোল্‌তা হ্যায় কি 'কুছ্ থোড়া' কেয়া মালুম নেহি হ্যায়। ক' বরষ লাগতা হ্যায় ?

—দো বরষ হোগা কি তিন ববষ হোগা।

দু' বছর কিম্বা তিন বছর ! ··· হায ! বছরটা কি এতোই কম দিন ? প্রতীক্ষার এক বছর যে একশো বছর।

—হামারা এই বেটাকো কেযা ভাগ্য হ্যায় ?

উতো রাজা হোবে।

ব্যস ব্যস, আর সন্দেহের কিছু নেই।

বুকের ধুকপুকুনি শান্ত হয়ে গেছে গৌরাঙ্গর।

সুধার কথার সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। সুধাকেও না কি বলেছিলো ছেলে রাজতুল্য হবে।

বাঙলায় প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় না ছাই, অপরের ভাষায় কি

মনের আকুতি ফোটে।···যাক যা হয়েছে তাই ঢের। বিশ্বাস জন্মে গেছে।

ব্যবসাদার লোকগুলো বোঝে মাতৃভাষায় প্রকাশিত আকুল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় বিপদ অনেক, তাই বাঙলার পল্লীগ্রামে এসে তার এই কৌশল। বাঁধাধরা উত্তরের ছক্ তাদের তালিকায় তৈরী আছে।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাড়ী ফিরলো গৌরাঙ্গ। নাঃ বৌদিকে আনতেই হবে একবার যে করেই হোক। অবিশ্যি খুব শক্তও নয়, মেলার বোলবোলাও তো রাত একটা অবধি থাকে, আর শশধর ঘুমোয় রাত এক প্রহর না হতেই। গানবাজনা লেখাপড়া সব কিছুর চর্চ্চা-বর্জ্জিত শশধর সারাদিন খাটে আর সাঁঝ পার না হতেই খায় আর ঘুমোয়।

সুধামুখী দাওযায় বসে চুল বাঁধছিল।

সামনে একটা কাঠের ডালা লাগানো হাত-আয়না, কাছের গোড়াষ তেলের বাটি, সিঁদুর কৌটো, হাতে চিরুনী, মুখে বিরক্তি। চুলগুলো তার বেজায় ভারী, নিজে সাব্যস্ত করে বাঁধাই দায়, জট ছাড়াতে হাত ব্যথা ক'রে, গোড়া বাঁধতে আলগা হয়ে যায।

অন্য অন্যদিন বাসন্তীকে যেন কৃপা করছে এই ভাবে চুলটা তা'র কাছে বেঁধে নেয়, কিন্তু আজ সকাল থেকে আর বাসন্তীর সঙ্গে সুধার বাক্যালাপ নেই। পুকুর ঘাটের ঘটনার পর থেকে সুধা তো রাগে গমগম্ করছেই, বাসন্তীও যেন অন্যমনস্ক উদাসীন, যেন শশধর সুধা নিভাননী সকলকে ছাড়িয়ে সংসারের অনেক ঊর্দ্ধে কোন অজ্ঞাত লোকে বিচরণ করছে বাসন্তী।

সংসারের কাজ কর্ম্ম করছেনা তা নয়, সবই করছে, কিন্তু যেন নিরাসক্ত ভাবে। তার এই আট বছরের আশ্রয়স্থল বাসুলডাঙার ঘোষালদের সংসারটা যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে।

সুধা এটা লক্ষ্য করেছে, তাই আজ নিজেই নিজের চুল নিয়ে বসেছে সে। ও অবশ্য ভেবে ঠিক করেছে এটা বাসন্তীর সুধাকৃত অপমানের প্রতিক্রিয়া।

এই সময় বাদলকে নিয়ে গৌরাঙ্গ বাড়ী ঢুকলো।

সুধা অর্দ্ধ সমাপ্ত বেণীর উপর অবগুণ্ঠন টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে ওঠে—এই ডন্‌ডনে রোদ্দুরে ছেলেটাকে সারাদিন ঘুরিয়ে মারলে, খাইয়েছিলে কিছু ?

—খাওয়াবো আবার কি ? গৌরাঙ্গ গায়ের জামাটা খুলে সেইটা দুলিয়ে দুলিয়েই বাতাস খেতে খেতে বলে—ভাঙা বাজারের খাবার খাইয়ে ছেলেটাকে কি ভবসিন্ধু পারে পাঠিয়ে দেবো ? ক'দিনের বাসি খাবার তা' জানো ?

সুধামুখী মুখখানাকে যতোটা সম্ভব বিকৃত করে তুলে বলে—বাক্যির কি মহিমা, কথা কইতে ঘেন্না করে। কেন বাসি খাবার ছাড়া আর কিছু নেই না কি জগতে ? সরবৎ খাওয়াতে পারোনি এক গেলাস, লেমনেড পাওয়া যায় না চণ্ডীতলায় ?

—লেমনেড, সরবৎ ? তা'র মানে হাতে হাতে কলেরাকে ডেকে আনা ? খাবারে তবু দেরী হ'তো, এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

সুধা রাগে গম্‌গম্ করে জুৎসই একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, গৌরাঙ্গ কথার সমাপ্তি টানে—এ কি আর তোমার পাকযন্তর সুধামুখী যে কেরোসিন তেলে ভাজা পাঁপরের দিস্তে বেমালুম হজম হয়ে যাবে ?

সুধা আর উত্তর দিতে পারে না, রাগে ওর ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

গৌরাঙ্গর এই এক অদ্ভুত কৌতুক স্পৃহা, সুধাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ওর যতো মজা।

মনটা উদাস হয়ে আছে বলে যে সংসারের কাজে জবাব দিয়ে বসে আছে বাসন্তী, এমন নয়। স্বয়ং শ্রীরাধিকাই পারতেন না এতো বড়ো দুঃসাহসের কল্পনা করতে, তা' এ তো বাঙলা দেশের একটি কমবয়সী বৌ। তা' ছাড়া ভয়টা তো শুধু তিরস্কারেরই নয়, অশোভনতারও বটে।

মেয়েমানুষ যে দুঃসাহস প্রকাশ করতে দ্বিধা করে সে কি কেবল ওপর-ওলার শাসনের ভয়ে? দ্বিধা করে আপন ভদ্রতা বোধের কাছে, দ্বিধা করে শোভন অশোভনতার কাছে।

বাসন্তী যদি আজ রাত্রির নির্জনতায় আত্মহত্যাই করে, তাই বলে কি সারাদিন বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে কাঁদবে? আজীবনের স্মৃতির রোমন্থন করে দেখবে, সে কবে কোথায় পেয়েছে এতোটুকু স্নেহ, এক কণা সহানুভূতি! নাঃ তেমন ব্যবহারের জবাবদিহি করবে কি দিয়ে?

হায় বাসন্তীর কেন একটি মাত্রও সন্তান হলো না, আর সে সন্তান শৈশবেই মারা গেলোনা কেন? তাহলেও তো বাসন্তীর কাঁদবার একটা উপলক্ষ্য থাকতো! অতি শৈশবে হারিয়ে ফেলা মা বাপকে মনে করে কাঁদতে বসাটা যে হাস্যকর। জীবনে শোকেরও বুঝি প্রয়োজন আছে।

এই সবই ভাবছিলো বাসন্তী উনুনের সামনে বসে। কাঠের উনুনের গনগনে আঙ্‌রার আভায় ওর গম্ভীর ফরসা মুখটা যেন প্রতিমার মুখের মতো অলৌকিক দেখাচ্ছিলো।

মনের মধ্যে এতো সমুদ্রের তোলপাড় তবু শ্বাশুড়ীর কাছে উপদেশ নিয়েছে কি রান্না হ'বে, যথাসময়ে দিয়েছে তুলসীতলায় প্রদীপ, ঝালের মাছে টাটকা সর্ষে বেটে দিতে ভোলেনি। অভ্যস্ত হাত পা, মনের নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না।

গৌরাঙ্গ এসে চৌকাঠ চেপে বসলো।

তাকিয়ে দেখলো বাসন্তীর স্তব্ধ আরক্ত মুখের দিকে, এ মুখের সামনে গৌরাঙ্গর মতো অবোধ জীবও যেন থতমত খেয়ে যায়।

গৌরাঙ্গ এসে বসেছে তা বসুক। আজ আর বাসন্তীর ভয় নেই কেউ দেখবে ভেবে। যে ইচ্ছে দেখুক, যার যা খুসি বলুক। তবে নিজে থেকে কোনো কথা ও কয় না, আপন মনে শুক্তি চালনা করতে থাকে।

বেশীক্ষণ চুপকরে বসে থাকা গৌরাঙ্গর পক্ষে অসম্ভব। একটু ইতস্ততঃ করে ও গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে—বৌদি দেখে এলাম, অবিশ্বাসের আর কিছু নেই।

বাসন্তী মুখ তুললো এবার।

—একটা মতলব ঠিক করেছি, দাদা তো রাত নটা না বাজতেই কাৎ হয়, তারপরে যাওয়া যাবে।

বাসন্তী অবশ্য মরীয়া, এবং মরণের আগে একবার নারাগণ দর্শনের জন্য ও বদ্ধপরিকর, তবু প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা বোধ হারায় না। তাই উদাস ভাবে বলে—পাগল!

সঙ্গে সঙ্গে রাগ চড়ে যায় গৌরাঙ্গর, চটে মটে বলে—ব্যস, হয়ে গেলো জজের রায় দেওয়া! 'পাগল' মানে কি? ঘরে বসে সন্ধ্যে রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনেন, বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝবেন কি করে? রাত একটার সময় মেলা তলায় চলুন না, দেখবেন কী জমজমাট। এগারোটা নাগাদ নিয়ে যাবো, বারোটার মধ্যে ঘুরিয়ে আনবো, কেউ জানতেই পারবে না।

—আর বেরোবার সময়? শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তো দাওয়ায় শুয়ে থাকেন।

—আহা সেও ভেবে রেখেছি, আপনার ঘরের ওই বাগানের দিকের

দরজাটি খুলে টুক্ করে বেরিয়ে আসবেন, আবার ওইখান দিয়েই ঢুকবেন।

'বাগান' অর্থে খানিকটা পড়ো জমি। একতলা বাড়ী, এই পড়ো জমিটার দিকেও ঘরের একটা করে দরজা আছে, সে দরজার ব্যবহার বিশেষ নেই, ট্রাঙ্ক বাক্স ঠেসানো থাকে সেখানে।

বাসন্তী বলে—ওখানে তো বাস্‌কোর গাদা।

—নিকুচি করেছে ছুতোনাতার! বাস্‌কো সরানো যায় না? টেনে একধারে সরিয়ে রাখবেন।

হঠাৎ বাসন্তী হেসে ফেলে বলে—পারি আমি? যা ভারী।

—চলুন সরিয়ে দিচ্ছি।

—খামোকা সরালে ও কি বলবে?

—কি আবার বলবে! খেয়াল করবে নাকি দাদা? ব্যাটাছেলের চোখ আপনাদের মতো অতো 'নিরীক্ষণে' নয় বুঝলেন! ঘবেব জিনিশটা এখান থেকে ওখানে গেলো কি না অতো সব বেটাছেলেতে দেখে না, নিজের হাতটা পাটা ঠিক থাকলেই হলো।

— ঠাকুরঝি যদি টের পায় ঠিক বলে দেবে।

বাসন্তীব মনে থাকে না, যে মৃত্যু সংকল্প করে বসে আছে তার আবার বলে দেবার ভযটা কি?

—আহা কি মুস্কিল! আপনার ঠাকুবঝির ঘুমটাই কি কম বাদসাহী নাকি? একবার ঘুমিয়ে পড়লে, গায়ের ওপর দিযে গরর গাড়ী চলে গেলেও ঘুম ভাঙে না। আর এক কাজ করবেন, দুই ভাই বোনকে ভুলিযে ভালিয়ে ঠেসে চারটি ভাত বেশী খাইযে দেবেন, তা'হলেই জঠরেব ভারে ঘুমে চোখ ভেঙে আসবে।

বাসন্তী হেসে ফেলে বলে—তা' যেন হলো, কিন্তু কি করে বুঝবো

এগারটা বেজেছে, দেওয়ালের ঘড়িটি তো আজ একমাস থেকে ভেঙে পড়ে আছে।

—আমি সঙ্কেত করবো বুঝলেন? মাঠের দিকের জানলাতেই তিনটি টোকা মারবো, ব্যস আপনি নিঃশব্দে দোরটি খুলে বেরিয়ে আসবেন। গায়ে বরং একটা চাদর মুড়ি দেবেন কেউ চিনতে পারবে না।

লোকটার এ জ্ঞান হয় না যে, প্রস্তাবটা কী সর্ব্বনেশে! আর বাসন্তী? সে বোধ করি যা থাকে কপালে মনোভাব নিয়েই রাজী হয়ে পড়ে।

— তা' হলে ওই কথাই ঠিক থাকলো?

- বেশ।

—আপনি নিজে আবার ঘুমিয়ে পড়বেন না তো?

—আমার চক্ষে আজ আর ঘুম আসছে না।

—তিনটি টোকা, মনে রাখবেন।

বাসন্তী ঘাড় কাৎ করে।

গৌরাঙ্গ এবার দোর ছেড়ে ওঠে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যে তা'র পিছন থেকে একটি ছায়া নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে খবর টের পায় না।

বাসন্তী নিপুণ হাতে রান্নাবান্না করে তোলে। যে ছেলেমানুষী অভিমানে সে মৃত্যু সংকল্প স্থির করে বসেছিলো, এই নতুন উত্তেজনায় সে অভিমানও যেন ঝাপসা হয়ে যায়। মৃত্যু সংকল্পটা যতো সহজ সত্যি মৃত্যুটা যদি তেমন সহজ হ'তো!

গৌরাঙ্গকে আগে খাইয়ে দিয়ে তারপর পরিপাটি করে ভাত বেড়ে স্বামীকে ডাকায় বাসন্তী সুধাকে দিয়ে।

সুধা এসে বলে—দাদা বললো এখন খিদে নেই একটু পরে খাবে।

এই দেখো কাণ্ড! বাসন্তী ভাবে সাত জন্মে অখিদে দেখি না, আর আজই কিনা—

—তা'হলে তুমি খেয়ে নেবে নাকি?

—আমি? কেন, আমার আবার এতো কিসের পেটের জ্বালা ধরেছে যে আর দু' দণ্ড তর সইবে না?

অগত্যাই বাসন্তী রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে।

বুকের মধ্যে আশঙ্কার আগুন, কল্কে ফলের বীজের মধ্যে আর কোনো ভরসা খুঁজে পায় না বেচারা। সকালবেলার মরীয়া মনোভাব আর নেই, তাই চিরঅভ্যস্ত ভীতিটাই মনের মধ্যে কাজ করছে।

গৌরাঙ্গকে বারণ করার উপায়ও আর নেই, সে তার অভ্যাস মতো সন্ধ্যের সময় খেয়ে নিয়ে চলে গেছে হয়তো স্টেশনে, নয়তো অন্য কোনো আড্ডায়। আসবে সেই ভয়ঙ্কর সময়ে!

কি হবে! কি হবে!

যদি শশধর না ঘুমোয়! এতো রাত করে খেয়ে তখুনি কি আর ঘুমোবে! হায় বিধাতার কি আর কোনো কাজ নেই, তাই শুধু বাসন্তীর ভাগ্যটা নিয়েই যতো খেলা তাঁর!

সুধা যতোই অহঙ্কার দেখাক, খাওয়ার সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই সে চক্ষে অন্ধকার দেখে, তাই একটু পরেই দাদাকে হাঁকডাক সুরু করে দেয়।

আর জীবনে বোধ করি এই প্রথম ননদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে বাসন্তী। হয়তো ভয় কাটলো, হযতো আশা আছে এখনো। নিজের

বড্ডো ঘুম পাচ্ছে ছুতো করে আলো নিভিয়ে দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়বে শশধর। মুহূর্তেই তো ঘুমিয়ে পড়ে, বাসন্তীর বাক্যজালের মাঝখান থেকে কোন্ ফাঁকে টুপ করে বেরিয়ে পড়ে তলিয়ে যায় ঘুমের অথৈ সমুদ্রে।

কিন্তু না, আজ আর তা হলো না।

বাসন্তীর অনুমানই ঠিক, তার ভাগ্যটা নিয়ে খেলা করা ছাড়া সত্যিই বিধাতা পুরুষের বোধকরি আর কাজ নেই এখন, তাই এমন অঘটন ঘটতে থাকে।

শশধরের নাকি আজ 'ঘুম আসছে না'।

বাসন্তী ব্যাকুল হয়ে বলে—মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো?

—না না মাথায় হাত বুলোলে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

—বাতাস করবো?

—মাথা খারাপ নাকি? দিব্যি শীতের আমেজ রয়েছে এখনো।

—তবে একটু জল খাবে?

—এই তো খেলাম।

—চোখে মুখে একটু জলের ঝাপটা দেবে?

শশধর হো হো করে হেসে উঠে বলে—কেন বলো তো? আমায় ঘুম পাড়িয়ে তোমার কিছু সুবিধে হবে নাকি?

শশধরের হাসিটা বাসন্তীর কানে যেন রাতচরা শিয়ালের হাসির মতো ঠেকে। ম্লান অপ্রতিভ ভাবে বলে—সুবিধে আবার কি!

—তা' কি জানি, নইলে এতো পতি ভক্তির ঘটা কেন? অন্যদিন তো শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি বলে গোঁসা হয়।

—বাঃ তোমার কষ্ট হচ্ছে যে।

—ও হো হো! আমার কষ্ট! নাঃ কষ্ট আমার কিছু হচ্ছে না, বরং বেশ ভালোই লাগছে গল্প করতে।

বাসন্তী কি করবে!

বাসন্তী কি করতে পারবে!

অস্থিরতা যে লুকোতে পারছে না ও। ম্লানালোক ঘরে হয়তো ধরা পড়ছে না চোখের তারার অস্থিরতা, ধরা পড়ছে না হাত পায়ের কম্পন, কিন্তু নিশ্বাসের চাঞ্চল্য গোপন করবে কি করে পাশাপাশি শুয়ে থাকা মানুষটার কাছে।

শুয়ে আর থাকতে পারে না বাসন্তী।

হে ভগবান একটা কিছু হবে না? একটা কোনো উপায়?

খেয়ালী গৌরাঙ্গ বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে না মারাত্মক সেই প্রস্তাবটা? যাহোক কিছু একটা বিপদ হ'তে পারে না তার?—ধরো রাস্তায় আসতে পা মচকে পড়ে থাকলো কোথাও···নয়তো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে যাওয়ায় উঠে আসতে পারলো না আড্ডার ঘর থেকে, কি ষ্টেশনে তার মাষ্টারদার আস্তানা থেকে!··· আচ্ছা সেই মাষ্টারদা না কে তা'রও তো কিছু হ'তে পারে? ধরো তারই হঠাৎ কিছু হলো, কেউ কোনোখানে নেই তার, গৌরাঙ্গ কোন প্রাণে একলা ফেলে চলে আসবে? অতো যখন ভালোবাসে!

চৌকী থেকে নেমে পড়তে যায় বাসন্তী, শশধর খপ্ করে ওকে ধরে ফেলে বলে—কি হলো নামছো যে?

—জল খাবো।

—তাই বলো নিজেরই তেষ্টা পেয়েছে। আচ্ছা খেয়ে আমাকেও নয় দাও এক গ্লাস।

পাছে কোনো ছুতোয় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে বাসন্তী, তাই তার এই ছুতো।

জল নিয়ে এসে দাঁড়াতেই শশধর ওকে বসিয়ে দেয় বিছানায়, মিটিমিটি হেসে বলে—তুমি আজ অমন অস্থিরপনা করছো কেন বলো তো? তোমার ধরণ দেখে একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।

বাসন্তী ফ্যাকাসে গলায় বলে—কি আমি অস্থির হচ্ছি? গল্প আবার কিসের?

—গল্প একটা বায়োস্কোপের। সে একবার কলকাতায় গিয়ে আমাদের সরকার মশাইয়ের ছেলের পাল্লায় পড়ে বায়োস্কোপ দেখা হয়ে গিয়েছিলো, সবটা মনে নেই তবে একটা জায়গা মনে আছে—একটা মস্ত জমিদার লোক, তার শিকারের ভারী সখ, খালি বন্দুক সাফ করে আর বাঘ সিংহী শিকার করতে বনে জঙ্গলে ছোটে, ধ্যান জ্ঞান সব ওই শিকার! এদিকে নিজের ঘরে যে তা'র অন্য শিকারের খেলা চলে সে খেয়াল নেই।······একদিন হঠাৎ লোকটা কি ভেবে যেন শিকার করতে বেরিয়ে মাঝ রাত্তিরে এলো ফিরে আর নিজের শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে শুনতে পেলো দু'জনার গলা। ভাবলো একা বৌ ভয় পাবে বলে বাড়ীর মেয়েরা কেউ হয়তো শুয়েছে। দোর ঠেললো, কিন্তু খুললে দেখে কেউ নেই, একা বৌ।·· সে নাকি ঘুমোচ্ছিলো তাই দোর খুলতে দেরী হয়েছে।

সেই জায়গায় দেখেছিলাম বৌটার সে কী অস্থিরতা। শোবে, না বসবে—দাঁড়াবে, না পায়চারী করবে, বুঝে উঠতে পারছেনা·· এই যেমন তুমি করছো।

—আমি আবার কি করছি—শুকনো গলায় কথাটা বলে বাসন্তী ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। শুয়ে বলে—ঘুমে আমি মরে যাচ্ছি আর তোমার এখন যতো আজগুবি গল্প।

—আহা ঘুমিও ঘুমিও গল্পের শেষটা শোনো, সে এক ভারী মজা!··· ঠাকরুণ কিছু না পেয়ে শিকারী পাখীটিকে ঘরের এক সিন্ধুকের মধ্যে চালান করে দিয়েছিলেন—সেকেলে জমিদার বাড়ীর রূপোর বাসনকোসন রাখবার প্রকাণ্ড বড়ো ভারী সিন্ধুক। ···শেষ অবধি বুঝতে পারছো? সিন্ধুকেই সমাধি হয়ে গেলো ময়না পাখীর।

বাসন্তী অস্ফুট একটা চীৎকার করে ওঠে।

—চমকে উঠছো, না? তা চমকাবার কি আছে? যে দুঁদে লোকটা বাঘ সিংহী শিকার করে, একটা মানুষের প্রাণ তার কাছে তো খেলার সামিগ্রী!···ভুল বলেছি? সিন্ধুকটায় আধমুনে একটা তালা লাগিয়ে তালার চাবিটা সে দীঘির জলে ফেলে দিলো। বেশ বুদ্ধির কাজ করে নি? ছবি দেখে আমি তো খুব তারিফ দিলাম লোকটাকে।

—তুমি আর তা দেবে না? তুমি যে কসাই!

তীব্র স্বরে বলে ওঠে বাসন্তী।

না, শশধরের আজ রাগ নেই, সে শকুনীর হাসি হেসে উত্তর দেয়—কসাই? উহুঁ ভুল বললে। আমি হচ্ছি হিঁদুর ছেলে, শক্তির উপাসক, যা করি এক কোপে।

বিশ্রী একটা শব্দ করে করে টিপে টিপে হাসতে থাকে শশধর, আর বাসন্তী সে শব্দে শিউরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাসন্তী স্তব্ধ হয়ে গেছে, শশধরও নিস্তব্ধ।

কার বুকের মধ্যে কী হচ্ছে সে আর পরস্পরের বোঝবার উপায় নেই, কারণ দু'জনে শুয়ে আছে যতোটা সম্ভব ব্যবধান রেখে। মুখ দেখবারও উপায় নেই, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা এই মাত্র নিভিয়ে দিয়েছে শশধর। ···

আর সহসা এই নিস্তব্ধতার বুকে কাঁটা পেরেক ঠোকার আওয়াজের মতো আওয়াজ হয় 'ঠুক ঠুক ঠুক'!

বাগানের দিকের দরজায় শব্দ হচ্ছে 'ঠুক ঠুক ঠুক'! ঘরের যে দরজার সামনে থেকে ভারী ট্রাঙ্কটা টেনে সরিয়ে রেখে গিয়েছিলো গৌরাঙ্গ বেরোবার আগে, আর যার সেই অবস্থাটা দেখে পর্য্যন্ত বাসন্তীর বুকে হাতুড়ী পড়েছে। যদিও শশধর সে সম্বন্ধে একটিও প্রশ্ন না করায় বাসন্তী শেষে ভেবেছে—বোধহয় চোখ পড়েনি তার।

বিলম্বিত 'ঠুক ঠুক' শব্দটা আর একটু দ্রুত তালে ধ্বনিত হয়, আর ঘুমের ভানে পড়ে থাকা চোখবোঁজা বাসন্তী অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে থেকেও টের পায় শশধর নিঃশব্দে খাট থেকে নামছে।

বাসন্তী কি উঠবে?·· ধড়মড় করে উঠে পড়ে দরজাটা চেপে দাঁড়াবে? না কি শশধরের পায়ে পড়ে মিনতি করে জানাবে বেচারা গৌরাঙ্গর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল মাত্র বাসন্তীর উপর মায়ায় পড়েই এমন নির্বুদ্ধিতা করতে এসেছে! ···না কি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সাবধান করে দেবে—ঠাকুর-জামাই শীগগির পালাও, তা নইলে তোমার দাদার হাতের প্রহার আছে তোমার অদৃষ্টে।

না, বাসন্তীর কোনো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই এখন, কেবল মাত্র নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি গণনা করা ছাড়া। সেখানেও যে শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্!

কিন্তু কতক্ষণ?

কতক্ষণ কান পেতে আপন বক্ষস্পন্দন শুনেছে বাসন্তী?

এক ঘণ্টা? এক মাস? ·· এক বছর···এক যুগ?

হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বর যেন বাসন্তীর চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে যায়। ধড়মড় করে খাট থেকে নেমে আসে সে।

ঘর অন্ধকার, কিন্তু বাগানের দিকের খোলা দরজাটা দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের যে মৃদু আলোক এসে পড়েছে তা'তে দরজার সামনের দৃশ্যটা দেখতে আটকায় না।

কিন্তু কি সেই দৃশ্য!

সে কি পরিচিত জগতের? বাসন্তী কি কোনো দিন দুঃস্বপ্নের মধ্যেও কল্পনা করতে পেরেছিলো কোনোদিনও এমন ভয়ঙ্কর এমন বীভৎস একটা দৃশ্যের দর্শক হ'তে হবে তা'কে?

শশধর কেন দরজাটা আটকে দাঁড়িয়ে আছে? হঠাৎ ঢুকে পড়া মানুষটাকে বেরোতে দেবে না বলে? ···কিন্তু শশধরের হাতে চকচক করছে ওটা কি? যাত্রার দলের টিনের তলওয়ার? ···না কি ওদের কাঠ চেরাই করবার ধারালো সেই কাটারীটা? ···শশধর এতো ভয়ঙ্কর! শশধর খুনী! ···যে শশধর বাসন্তীর স্বামী! মানুষের মাথার উপর খাঁড়া তুলে ধরতে আটকায় না তার!

কিন্তু মানুষটা কে!

বিদ্যুতগতিতে দৃশ্যটার উপর আছড়ে পড়ে বাসন্তী—

—ওগো সর্ব্বনাশ কোরো ন', ও যে ঠাকুরজামাই!

দাঁতে দাঁত পেষা একটা কটু কণ্ঠের চাপাস্বর যেন ঘরের অন্ধকারকে আরো ভারী করে দেয়—ঠাকুরজামাইয়ের সোহাগ জন্মের শোধ ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

শক্তির উপাসক শশধর কোন অবসরে এই মারাত্মক অস্ত্রটাকে শয়ন মন্দিরে এনে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলো কে জানে।

নাঃ তারপরে আর কিছু ঠিক করে বলা শক্ত। আর কিছু বুঝতে পারলো না বাসন্তী ··· শুধু সেই মারাত্মক অস্ত্রটা মাটিতে ছিটকে পড়ার

একটা তীব্র শব্দ···রোগা হাড়গিলে লোকটার মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ··· বাড়ীর ভিতর দিকের খিল বন্ধ কপাটটায় মুহুর্মুহু ধাক্কা মারার শব্দ···

আর ঘরের মেঝেয় গড়িয়ে যাওয়া খানিকটা রক্ত।

এর চাইতে আরও বেশী কিছু চৈতন্যের জগতে ধরে রাখতে পারবে এতো সবল স্নায়ু বাসন্তীর নয়।

যারা কপাটে করাঘাত করে করে হতাশ হয়ে বাগান দিয়ে দেখতে এসেছিলো, তারা তো খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পেলো, বাকী দৃশ্যটা দেখে মনে রাখবার ভার তা'দের।

তা' তারা শুধু মনে রেখেই ক্ষান্ত হবে কেন, তারা তো শশধরের মা আর বোন। আর বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের যতো অবনতিই আজ ঘটে থাকুক তবু সহরের লোকের মতো মাঝরাত্রে আচম্‌কা পড়শীর ঘরে কান্নার রোল উঠলে গায়ের ঢাকাটা ভালো করে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শোয় না। কে জানে কিসে বাধে তাদের, মনুষ্যত্বে না চক্ষুলজ্জায়।

নিভাননী আর সুধামুখীর প্রচণ্ড চীৎকার "শুনতে পাইনি" বলে অস্বীকার করা তো আর সম্ভব নয়! কাজেই শশধর ঘোষালের বাড়ীতে গ্রাম সুদ্ধ লোকের পায়ের ধুলো পড়তে দেরী হয় না।

—মাষ্টার দা, মাষ্টার দা!

ঘুমন্ত মাষ্টারমশাই চমকে বিছানায় উঠে বসলেন। কে ডাকে! চেনা গলা যে! ··· কিন্তু না না ও আবার এখন ডাকতে আসবে কেন, বোধ হয় স্বপ্ন। ··· স্বপ্ন? ··· তবে আবার ডাকে কেন ··· 'মাষ্টার দা, মাষ্টার দা'!

পাতলা একহারা কাঠের জানলার ফাটলে মুখ রেখে চাপা উত্তেজিত স্বরে ডেকেই চলেছে সে—'মাষ্টার দা মাষ্টার দা'!

গায়ে ঢাকা কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মাষ্টার।

—কী ব্যাপার গৌরাচাদ! হঠাৎ এ সময়ে?

—আমি খুন করে ফেলেছি মাষ্টার দা, দাদাকে খুন করে ফেলেছি আমি।

না, মাষ্টারমশাই গৌরাঙ্গর মতো অমন একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ উন্মাদ নন, বাস্তব বুদ্ধি কিছু আছে তাঁর। …তিনি বিনাপ্রশ্নে ওর একটা হাত ধরে প্রায় হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের ঘরের মধ্যে পুরে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেন, দিয়ে চাপা গলায় বলেন—চুপ চুপ একেবারে চুপ! …খবরদার আর ওকথা উচ্চারণ করবি না, দেয়ালেরও কান আছে!

—কিন্তু মাষ্টার দা, আমি যে থানায়—

—চুপ কর বলছি গোরা, ভালো চাস তো চুপ কর—চাপা গলায় যতোটা তীব্রতা প্রকাশ পেতে পারে তা' পায় মাষ্টার মশাইয়ের কণ্ঠস্বরে—আর দ্বিতীয়বার যদি ও কথা উচ্চারণ করিস গোরা, তুইও খুন হবি আমার হাতে। …সব শুনবো, রোস আগে একটু হাঁফ জিরো।

বলে নিজেই হাঁফাতে থাকেন মাষ্টার।

কিন্তু কেমন করে চুপ করে থাকবে গৌরাঙ্গ?

উত্তাল সমুদ্র কি পারে স্থির হয়ে চুপ করে থাকতে? সে কি নিষেধের বাঁধ মানে?

—মাষ্টারদা, আমায় পুলিশে নিয়ে চলো।

—ফের গোরা, তুই আমাকেই আত্মঘাতী হতে বলিস?

—কিন্তু আমি যে খুন করেছি মাষ্টারদা! যে আমায় এতদিন ধরে খাওয়ালো পরালো, বাড়ীতে জায়গা দিলো—

কথা আর শেষ করতে পারে না গৌরাঙ্গ, তা'র এতক্ষণের আতঙ্কিত শুষ্ক কণ্ঠ এবার বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে।

—হা ভগবান! …সমস্ত আকুলতার শেষ আশ্রয় ভগবানকে একবার ডাক দিয়ে মাষ্টার মশাই বলেন—রোস তুই আগে একটু সামলা, তারপর ঘটনাটা আমাকে সব খুলে বল। আমি বিবেচনা করে দেখি—

—আমি আর এক মিনিটও বাঁচতে চাই না মাষ্টারদা, নিজের হাতে করে বৌদিকে বিধবা করলাম আমি! …ও মাষ্টারদা, আমায় একখুনি পুলিসে নিয়ে চলুন! ফাঁসি না হলে আমি শান্তি পাবো না।

সহসা একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করে মাষ্টার মশাই ভগ্নস্বরে বলে ওঠেন—তবে আর কি, তুমি শান্তি পেলেই সব হলো! স্বার্থপর গোঁয়ার! …বলি আর একটা মেয়ের কথা ভাবছিস না? তুই ফাঁসিতে ঝুললে সে বিধবা হবে না? বাদলার কথা মনে পড়ছে না? …তুই গেলে তার কী অবস্থা হবে ভাবছিস? …আর…আর এই বুড়োটার—নাঃ আমার কথা কারুর ভাববার দরকার নেই, কারুর ভাববার দরকার নেই! আমি কে! …আমি কে!

অনেক চেষ্টায় অনেক প্রশ্নে ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন মাষ্টারমশাই। সর্ব্বনাশের বাকী কিছু রাখেনি! ধাক্কা মেরে শশধরকে সরিয়ে দিতে যাবার ফলে নিজের অস্ত্রে নিজেই খুন হয়েছে শশধর। তবু গৌরাঙ্গ গাঝাড়া দিয়ে বাঁচবে কি করে? ও কেন ধাক্কা দিলো।

—কিন্তু তোরই বা দোষ কি—মাষ্টার মশাই হতাশ আক্ষেপে বলেন—মাথার ওপর যমের খাঁড়া উঁচোনো দেখলে কি আর মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে? …গোড়াগুড়িই ভুল হয়েছিলো তোর, তার পরিবারকে সে যেমন খুসি চালে চালাবে, তুই কেন ওর মধ্যে মাথা গলাতে গেলি?

—বৌদিকে আপনি দেখেননি মাষ্টারদা, দেখলে·· সেই লক্ষ্মী প্রতিমাকে আমি বিধবা করে এলাম মাষ্টারদা !

—থাম থাম, মেয়ে মানুষের মতন আর প্যান প্যান করে কাঁদতে হবেনা, যা বলছি তাই করবি। ··· এ জন্মে আর এই বাসুলডাঙার মুখো হবি না। ·· অনেক দূরে চলে যাবি,...অনে—ক দূরে। এ গাঁয়ের লোক যেখানের ত্রিসীমানায় যায় না।

—কিন্তু আপনাদের সঙ্গে তা'হলে দেখা হবে কি করে মাষ্টারদা ?

—না হোক, না হোক—কণ্ঠে রুদ্ধ সমস্ত ক্রন্দনের বাঁধ এবারে ভেঙে পড়ে—তুই তো বেঁচে থাকবি। তা'হলেই হলো, তা' হলেই হলো।

—বাদলাটাকে দেখবেন মাষ্টারদা।

—থাক থাক সে আর বলতে হবে না তোকে। ওকে বড়ো করে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবো আমি, তবে তো আমার ছুটি !

ট্রেণ আসবে শেষ রাত্রে। আধ মিনিট থামে বাসুলডাঙায়। এ ট্রেণে বড়ো কেউ যায় না, বেলা চারটের গাড়ীটাই সকলের জানা। নাঃ এ ট্রেণে পরিচিত কেউ থাকবে না নিশ্চিত। দূরের থেকে আসছে অনেক মানুষ বোঝাই হয়ে — অন্ধকারে গা ঢেকে টুক্ করে উঠে পড়ে একবার ভীড়ের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ওয়াস্তা। তারপর কার সাধ্য ধরে ছোট্ট এই ষ্টেশনটা থেকে কে উঠলো, কেমন তার চেহারা, কী তার বয়েস ! ·····

···কে ধরতে পারে, পিছনে কোন ভয়াবহ ইতিহাস ফেলে রেখে গেলো সে !

অপস্রিয়মান ট্রেণটার দিকে তাকিয়ে থাকেন মাষ্টারমশাই। কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়নি, ট্রেণ 'পাশ' অর্ডার দিয়েছেন নিত্যনিয়মে। শুধু ওটা যখন

চলে গেলো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন সেই প্রায়ান্ধকার কাঁচা প্লাটফরমটার উপর।

তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসেন নিজের অফিস ঘরে। মনে হয় একটা পাথরের মূর্ত্তি বুঝি ধীর মন্থর গতিতে হেঁটে চলে যাচ্ছে!

ড্রয়ারটায় কি চাবি লাগানো আছে? না চাবি লাগানো নেই—খোলাই পড়ে থাকে, খোলাই পড়ে আছে।

লক্‌লকে খানিকটা আগুনের শিখা দেখে পয়েণ্টস্‌ম্যানটা ছুটে আসে কোথা থেকে। বলে—কি হলো!

ধীরে ধীরে তাকে একটা হাত নেড়ে চলে যাবার ইসারা করেন মাষ্টার-মশাই। এ সময় মানুষ অসহ্য, কথা অসহ্য!

একমাত্র সন্তানের চিতাগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকার মতোই অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাষ্টার সামনের শিখাগুলোর দিকে!

সন্তানের চাইতে কি এর মূল্য কিছু কম?

এ ও তো আপন সৃষ্ট বস্তু — অনেক যত্নের, অনেক পরিশ্রমের, অনেক আশার!

অনাহত কালস্রোত বয়ে চলেছে আপন নিয়মে।

সৃষ্টির আদি থেকে তা'র অক্লান্ত এই চলা।...কোথাও দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় নেই, উপায় নেই কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবার।...রূপ

নেই রং নেই জোয়ার নেই ভাঁটা নেই, শুধু আছে দিন আর রাত্রির ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।

তবু মানুষ তা'তে আরোপ করেছে রং আর রূপ। সময়ের অনাহত স্রোতকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি, তবু ভাগ করে নিয়েছে কাল্পনিক খণ্ডে খণ্ডে! চিহ্ন করে নিয়েছে দিন মাস বছরের হিসেবে।

কিন্তু সে হিসেবের কি সত্যিই কোনো মূল্য আছে?

'দিন' মানেই কি চব্বিশটি ঘণ্টার সমষ্টি মাত্র?

সময়ের ভার কি সকলের কাছেই সমান? ...যারা সুখী যারা সহজ যারা স্বাভাবিক, তা'দের কাছে সময়ের কোনো অনুভূতি আছে? তা'রা জানে গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, বর্ষার পর দেখা দেয় শরৎ। তা'রা জানে দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন।

কিন্তু যে অস্বাভাবিক জীবনে শুধু রাত্রিই এসে থেমে থাকে, দিন আর আসে না, জীবনের সমস্ত কপাট রুদ্ধ করে দিযে রাজত্ব করতে থাকে শুধু অন্তহীন অন্ধকার, সে তো জানে সময়ের অর্থ কি! সমযের হিসেব হয় কি দিয়ে!

কতোদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে গৌরাঙ্গ? মানুষে গড়া ক্যালেণ্ডারের হিসেবে হয়তো মাত্র ছ'মাস, কিন্তু সেই হিসেবটাই তো সত্য নয়!.. ছ'যুগ ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গৌরাঙ্গ তাড়া খাওযা জন্তুর মতো।...এখান থেকে ওখান, কাছ থেকে দূরে।

পালিয়ে বেড়ানোরও বুঝি একটা নেশা আছে।.. যেখানে কেউ ধরে ফেলবার নেই, কেউ চিনে ফেলবার নেই, যারা স্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না এই নিতান্ত সহজ চেহারার লোকটার পিছনে রয়েছে একটা রক্তাক্ত ইতিহাস, হতভাগা লোকটা তাদের কাছ থেকেও পালিয়ে যাবে।

একটানা দুটো পাঁচটা দিনও কোথাও টিঁকে থাকবে না। হয়তো কোথাও পাবে এতোটুকু সদয় মমতা, এতোটুকু অহেতুক স্নেহ, অমনি সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠবে তার।

কেন ?

কেন এদের এই অকারণ করুণা ? নিশ্চয় ধরিয়ে দেবার মতলব ! তবে পালাও সেখান থেকে। ... পথে দু'টো লোককে মুখোমুখি কথা কইতে দেখলেই মনে করে ওর কথাই কইছে বুঝি, পিছনে কাউকে হাঁটতে দেখলেই স্থির করে নেয় ওকেই অনুসরণ করছে সে।...যে নিজের বুকের মধ্যে সন্দেহের বাসা নিয়ে বেড়াচ্ছে, পৃথিবী তার কাছে সহজ হবে কেমন করে ?

অথচ সত্যিই কি গৌরাঙ্গ প্রাণের ভয়ে এমন ছুটোছুটি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ? গৌরাঙ্গর স্বভাবের পক্ষে কি সেটা খাপ খায় ?

নাঃ গৌরাঙ্গর তো প্রাণের উপর তেমন কোনো মমতা ছিলোনা কখনো, সহজ সুন্দর জীবনে থাকতেও নয়। অসঙ্গত অসমসাহসিকতার জন্যেই তো বিখ্যাত ছিলো ও। ...কেউ কখনো সে দুঃসাহসিকতার প্রতিবাদ করলে হাসতে হাসতে বলতো—'আরে বাবা একবার বৈ তো দু'বার মরবো না ? অতো মেপে জুপে চলতে পারি না।'

সেই মানুষ কেন পালাচ্ছে এমন বিতাড়িত পশুর মতো ?

এই এক অদ্ভুত রহস্য !

সত্য বটে, জড় প্রকৃতি চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে—বুদ্ধির অভিব্যক্তিহীন নির্ভুল সেই চলা। মনুষ্য প্রকৃতি চায় নিয়ন্তার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করতে।...

কিন্তু সত্যিই কি পারে ? বোধহয় পারে না। তার স্বাধীন চিন্তাশক্তির একেবারে মূলকেন্দ্রে কোথায় বুঝি আছে একটা অর্থহীন জড়তা, একটা মূঢ়

আনুগত্য। তাই সে একবার যা সুরু করে, তার থেকে ফেরাতে পারে না নিজেকে। গ্রহ নক্ষত্রের অলাত চক্রের মতো আপনার চারিদিকে রচনা করে একটা দুর্ভেদ্য চক্র, আর আবর্তিত হতে থাকে তাকেই কেন্দ্র করে। …হত-ভাগা লোকটারও ঘটেছে সেই অবস্থা।

একবার বুঝি কে ওর চৈতন্যের দরজায় ঘা মেরে বলেছিলো—'পালা পালা…এখান থেকে অনেক দূরে!…না পালালে তোর রক্ষা নেই—' সেই-টুকু শুনেই সেই যে ধরেছে পালানোর নেশা, তা' থেকে ওর আর মুক্তি নেই।

সেই নেশার বিষে বাকী চৈতন্য সব অসাড় হয়ে গেছে, মগ্ন হযে গেছে নিজের মধ্যে। বহির্জগৎ ওর কাছে লুপ্ত। মনের মধ্যে শুধু একটি মাত্র শব্দ অনাহত সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে 'পালাতে হবে।' ·· 'এখান থেকে অনেক দূরে'। …

কোনখান থেকে সে দূরত্বের সীমারেখা তা জানে না সে, তাই হযতো কখনো দীর্ঘ পনেরোটা দিন ধরে পালিয়ে বেড়ায় একটা জাযগাকেই কেন্দ্র করে। কোথাও পায় আশ্রয়, কোথাও একটু প্রীতির স্পর্শ পেয়ে বিগলিত হয়, আবার—যখন কোথাও জোটে অপমান লাঞ্ছনা সন্দেহ, তখন মাথাহেঁট করে চলে যায়।

এ কি সেই মানুষটা?

এই কিছুদিন আগেও যার উদাত্ত কণ্ঠের গান পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে বুঝি আকাশে উঠতো, যার হাসির আলোয় অনেকখানি জাযগা আলোকিত হযে উঠতো, নিতান্ত শিশুর মতোই যে অবোধ লোকটা জানতোনা পৃথিবীতে ঘৃণা আছে, হিংসা আছে সন্দেহ আছে। এই আবরণটার মধ্যে এখন কি আর চেনা যায় তা'কে?

ধূলিধূসর দেহ, রুক্ষ মাথা, কালি মাড়া তামাটে রং, কখনো খায় কখনো খায়না। ···একবার একটা চায়ের দোকানে কিছুদিন কাজ করেছিলো তারা দিয়েছিলো দুটো কাপড় জামা, সেগুলোও কাচার অভাবে মলিন।

কাজের ইতিহাস অদ্ভুত। তখনো চেহারায় লাগেনি এতটা রুক্ষতার ছাপ।

দোকানের ধারে বসেছিলো, মালিক বললো—এই কাজ করবি ?

গৌরাঙ্গ মাথা নাড়লো উদাসভাবে।

—না কেন, করনা ?

—ইচ্ছে নেই।

—তা থাকবে কেন। খেটে খাবার ইচ্ছে আর জগতে ক'টা আহাম্মুকের থাকে ! বলি চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতদিন পেটে দানাপানি পড়েনি, কাজ করবিনা কেন ? করনা খেতে পাবি।

চতুর লোকটা ভাবছিলো —পাগলা পাগলা ধরণের লোকটাকে দিয়ে শুধু খাওয়ার বিনিময়ে পুরো খাটিয়ে নেওয়া যাবে। তাই উদারতার ভান করে বলেছিলো — নে আয় আজ আর কিছু কাজ করতে হবেনা। অমনি খেতে পাবি। কাল সকাল থেকে কাজে লাগবি বুঝেছিস? আজ বরং কাপড়-চোপড় ধুয়েস্নান করে পরিষ্কার হয়ে নে। ···দাড়ি গজিয়েছে দেখো ব্যাটার, যেন মা মরেছে । নে চারটে পয়সা নে, ওই ওখানে মোড়ের মাথায় নাপিত বসে আছে, যা দাড়িটা কামিয়ে আয়।···ও বাবা এযে দেখি জাত কেউটে—গলায় পৈতের গোছা !···ভালো ভালো।

ওকে দাড়ি কামাতে পাঠিয়ে মালিক অনেক আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখছিলো। চাকরের কাজতো করবেই লোকটা, তাছাড়া —এই যে নিত্য গণেশ পূজার জন্য পূজারী রাখতে হয়েছে মাস মাইনে তিন তিনটে টাকা দিয়ে, সেটাও তো একে দিয়ে বাঁচানো যায়।

তাছাড়া বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে বাড়ীতে গিন্নীর লক্ষ্মীপুজোর জন্যে পাড়ার পুরোহিতের বরাদ্দ আছে একটাকা, বাঁচবে সেটাও।

এছাড়া—ফি বছর বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে একজন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়, বরাবর নিয়মটা মেনে আসছে, ফেলতে পারেনা। একে বাড়ীতে রাখলে, ব্যস মস্ত একটা খরচের দায় থেকে অব্যাহতি। একেই খাওয়ার শেষে চারটে পয়সা ভোজন দক্ষিণা বলে ধরে দিলেই মিটে গেলো কাজ। খেতোই তো, একটা লোক কিছু আর দুটো পেট নিয়ে খেতে পারবে না !

এতোগুলি আশা নিয়ে প্রথম কটাদিন গৌরাঙ্গকে বেশ তোয়াজ করছিলো লোকটা, কিন্তু আশাভঙ্গ হতে বেশী দেরী হলোনা তার। প্রতিপদে ধরা পড়তে লাগলো গৌরাঙ্গর আনাড়ীত্ব। সেখান থেকে হলো বিদায়। কি জানি কেন বিশেষ লাঞ্ছনা জোটেনি। হয়তো 'জাত কেউটে' বলেই।

এরপর এক ভদ্রলোকের বাড়ী পেয়েছিলো আশ্রয়। পৃথিবীতে অহেতুক স্নেহ একেবারে নেই, এমনতো হতে পারেনা। পৃথিবীটা তাহলে টি কে আছে কিসের জোরে ?

কিন্তু সেখানেও এলো ভয়।

একদিন কর্ত্তার এক হিতৈষী এসে বেপরোয়া গলা ছেড়ে বন্ধুকে সাবধান করলেন—বাড়ীতে তো জায়গা দিয়েছো হে, বলি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়েছো ? চেহারা দেখলে তো মনে হচ্ছে ফেরারী আসামী—

কর্ত্তা বললেন—না হে না ! লোকটা অদ্ভুত সরল, ওর কথাবার্ত্তা শুনলেই বুঝতে পারবে ··· কয়ে দেখো।

তা' কয়ে আর দেখতে হলো না। কথা কইতে এসে তাঁরা দেখলেন

খাঁচা শূণ্য। অতঃপর একজন মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসলেন, আর অন্যজন খুঁজতে বসলেন—বাড়ী থেকে কিছু খোয়া গেছে কি না।

হঠাৎ একদিন ওকে দেখা গেলো বর্দ্ধমানে একটা 'পাইস হোটেলের' পিছনের দরজার কাছে যেন কার অপেক্ষায়। একটু পরেই দোর খুলে বেরিয়ে এলো হোটেলের ঠাকুর, হাতে তার কাঁসিতে করে এক প্রস্থ ভাত বাড়া।

ভাতটা হাতে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠাকুরটা বলে—আজ আর ভিতরে যাওয়া চলবে না, এখানেই কোথাও বসে খেয়ে নাও।

গৌরাঙ্গের প্রেতাত্মা!

তবু সে হতাশ হয়ে চারিদিকে তাকায়—সঙ্কীর্ণ গলি, আবর্জ্জনার স্তূপে নরককুণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ, অদূরেই একেবারে রাজরাস্তা।

—এখানে কোথায় খাবো? এখানে বসে খাওয়া যায়?

বামুন ঠাকুর গলা নামিয়ে বলে—তা' কি করবো? মাসের এখন শেষাশেষি, এই সময় কর্ত্তার 'ইনিস্‌পিকশানের' ধুম বাড়ে বুঝলে?···সকাল থেকে এসে বসে আছে, রাতের আগে নড়বে না। আমার ওপর ওর সন্দেহ আছে কিনা। একবার যদি টের পায়, তা'হলে তোমারও খাওয়া ঘুচবে, আমারও চাকরী ঘুচবে।···নাও নাও বসে পড়ো।

—এখানে বসতে পারবোনা।

—নাও ঠেলা! আমি কি তোমার ভাত হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবো? ঝি বেটি তেমনি শয়তান, জানতে পারলে রক্ষে নেই, একখুনি কর্ত্তার কান ভারী করবে। আজকের মতো খেয়ে নাওনা যা তা করে।

লোকটার মিনতিতে গৌরাঙ্গ আবার এদিক ওদিক তাকালো ··· নাঃ

অসম্ভব! ··· কুটনোর খোসা, পচা মাছের আঁশ ··· রাশিকৃত পোড়া কয়লা আর ছাই। এখানে খাওযা? সে কি পথেব কুকুর!

—ভাত নিয়ে যাও। আজ আর খাওযা হবে না।

লোকটা ছটফট করছিলো, কাজেই আর অনুরোধ উপরোধ করলো না। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—রাতের বেলা অন্ধকারের ছ্যাকে এসো তা'হলে বুঝলে?

—আচ্ছা।

ধীরে ধীবে মাথা নীচু করে ফিরে চলতে থাকে গৌবাঙ্গ, বামুন ঠাকুরটা একটুক্ষণ দরদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে, হয়তো বা দরদের সঙ্গে মিশে আছে কিছুটা সম্ভ্রম। তারপর নিশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে দেয।

পথের আলাপ, কিন্তু ওর কেমন একটা ধারণা হয়েছে লোকটা বড়ো লোকের ছেলে, রাগ করে বাড়ী থেকে পালিযে এসেছে। তাই তাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো হোটেলের রান্নাঘরে। ··

তদবধি ক'দিন ধরে চলছিলো এই ব্যবস্থা।

খদ্দেরের ভীড় একটু কমলেই পিছনের এই দোরটা খুলে এদিক ওদিক তাকায়, দেখে গৌরাঙ্গ দাঁড়িযে আছে, হয়তো বা জঞ্জালের রাশি বাঁচিয়ে পায়চারী করছে। ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আবার ছেড়ে দেয়।

অবশ্য এ ব্যবস্থাটা কেবলমাত্র গৌরাঙ্গর জন্যই সৃষ্ট নয়। এই উপাযে অনেক সময়ই অনেক দেশোয়ালী ভাইকে আপ্যায়ন করে সে।

কিন্তু কোন্‌ আকর্ষণে বর্দ্ধমান সহরে এসে আটকে গেছে গৌরাঙ্গ? কোথা দিয়ে কেমন ভাবে এসে পড়েছে সে কথা আর মনে নেই।

তবু অনেক দিন হয়ে গেলো রয়ে গেছে এখানে। কেন কে জানে। কে তাকে আটকে রেখেছে? হোটেলের ঠাকুরের হৃদয়মাহাত্ম্য মিশ্রিত নিশ্চিত অন্নের প্রলোভন, না আর কোনো অনিশ্চিত আশার প্রলোভন!

বৰ্দ্ধমান!

কতোদিন আগে দেখা এই অক্ষর ক'টি। ছাপার অক্ষর নয়, মেয়েলি হাতের লেখা গোটা গোটা অক্ষর! আরো কি কি লেখা ছিলো, কিন্তু সে সব আর মনে নেই। শুধু মনে পড়ছে বৰ্দ্ধমান! আর কি যেন একটা আশ্বাস।

কে যেন বলেছিলো—'বেশ করেছিস পালিয়ে এসেছিস, ও সব সর্ব্বনেশে মেয়ে'!··· যে বলেছিলো তাকে ভাবতে গেলে বুকের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করতে থাকে ··· তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা ··· অনেক দৃশ্য হুড়মুড় করে এসে পড়ে। ··· সে দৃশ্যের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে সেই একটা দৃশ্য। ··· না ·· না ··· তা'র ধারে কাছে যেতে পারবেনা গৌরাঙ্গ, তা'হলে ওর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাবে। তার চাইতে সব চাপা থাক ·· পাথরের ওপর পাথর। ··· সে পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাক মাষ্টারদা, বাদল, বৌদি, সুধামুখী। ··· সমাধি হয়ে যাক সেই অগ্নি দৃশ্যের।

'সর্ব্বনেশের' সন্ধানেই তো ঘুরবে এখন গৌরাঙ্গ।

কিন্তু শুধু সহরটীর নাম মনে থাকলেই কি সব হলো? 'সর্ব্বনেশের'ও ঠিকানা জানা চাই। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ ভারী একটা ধিক্কার এলো গৌরাঙ্গর। ঠিক এ রকমটা বোধ হয় আর কোনোদিন হয় নি।

ডাষ্টবীনের ধারে খেতে বসতে দেবার প্রস্তাবেই কি আজ হঠাৎ নিদ্রিত নারায়ণের সুপ্তি ভঙ্গ হলো?

দূর ছাই! বেঁচে থাকার গলায় দড়ি! মনে মনে উচ্চারণ করে গৌরাঙ্গ। ···রাস্তার কুকুরের মতন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো আর লোকের ভিক্ষের ভাত খেয়ে প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখা, এর কোনো মানে হয়!

সুধার মাছ থাওয়া বজায় রাখার জন্যে এতো হীনতা সহ্য করা! ছ্যা ছ্যা! তা'র চেয়ে ও পুলিশের হাতে গিয়ে ধরা দেওয়া হাজার গুণে সুখের। বৌদির থাওয়া পরাতো জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিয়ে এলাম!

'এলাম' ভেবেই স্তব্ধ হয়ে যায়, ভিতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রনা হতে থাকে, তবু অস্বীকার তো করা যায় না। অসতর্কে নিজের অস্ত্রে নিজেই সংহার হয়েছে শশধর, এই যুক্তিটাকে কিছুতেই নেওয়া যায় না মনের মধ্যে।

নাঃ গৌরাঙ্গ খুনী ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে কি হবে এই ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবনটা নিয়ে কুকুর বিড়ালের মতো পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোয়? ··· বাদল, মাষ্টারদা, বৌদি ··· কাউকে যদি কোনোদিন দেখবার উপায়ই না রইলো, তবে বেঁচে থাকা আর ফাঁসি হওয়ায় পার্থক্যটা কোথায়?

নাঃ পুলিশের হাতে ধরা ও দেবেই।

শুধু—শুধু—ফাঁসি যাবার আগে একবারটি যদি ওদের দেখতে পাওয়া যেতো! ...

চিরদিনের স্ফূর্তিবাজ তরলচিত্ত লোকটার বুঝি চিন্তাশক্তিও হয়েছে আজকাল! ··· ভাবে বেচারা সুধা, ওর কাছেও একবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া দরকার, চিরটাকাল অবজ্ঞা আর কৌতুক করে এসেছে।

কিন্তু শুধুই তো সুধামুখীর কাছে চাইলেই শেষ হলো না, ক্ষমা চাইতে হবে—বৌদির পায়ে পড়ে, ক্ষমা চাইতে হবে মাষ্টারদার কাছে, চাইতে হবে বাদলের কাছে। বাপ হয়ে কোন কর্ত্তব্যই করতে পারলো না তার উপর, আবার চিরকলঙ্কিত করে রেখে গেলো তাকে খুনীর ছেলে বলে! ···

আবার সেখানে—সেই ঊর্দ্ধলোকে গিয়ে ক্ষমা না চাইলেও তো নয়। শশধরকে বুঝিয়ে বলতে হবে কী তুচ্ছ একটা কারণেই এমন কাণ্ডটা ঘটে গেলো!

নির্বোধ গৌরাঙ্গর তুচ্ছ একটু নির্বুদ্ধিতার খেসারত দিতে তুমি তোমার প্রাণটাই খোয়ালে!

গৌরাঙ্গর প্রতি শশধরের আক্রোশের কারণটা ভাবলে আজকাল যেন একটু একটু বুঝতে পারে গৌরাঙ্গ। বুঝতে পেরে প্রাণের ভিতর হাহা করে ওঠে তার। মনে হয় কেমন করে শশধরকে গিয়ে বুঝিয়ে দেবে—তোমার ধারণা কতো ভুল, তোমার সন্দেহ কতো অমূলক! অকারণ এতো কষ্ট পেয়েছো তুমি!

রুক্ষ কটুভাষী আক্রোশপরায়ণ শশধরকেও যে সে এতোটা ভালোবাসতো জানতো না আগে। কটুভাষী বড়োভাইকেই কি ভালোবাসেনা লোকে—ভালোবাসাই যার সহজাত ধর্ম্ম তেমন লোক?

না না, ফাঁসিতে ঝোলা ছাড়া উপায় নেই গৌরাঙ্গর, শশধরের সঙ্গে দেখা করতেই হবে তাকে। 'অপঘাতের মড়া' আর 'ফাঁসির মড়া' যে, নরককুণ্ডের একই 'কুণ্ডে' আশ্রয় পায়, এ বিষয়ে গৌরাঙ্গ নিশ্চিত।

—এই এই—রিকশঅলা থামাও থামাও!

গৌরাঙ্গ চমকে তাকায়·· আর এতোক্ষণের সমস্ত বৈরাগ্য চিন্তা ভুলে অভ্যস্ত নিয়মে পালাতে চেষ্টা করে।·· প্রায় ঘাড়ে এসে পড়া সাইকেল রিক্সা খানার লক্ষ্য বস্তু যে গৌরাঙ্গই, এতে আর সন্দেহ থাকে না তার। আর কেন যে লক্ষ্য সেটা বুঝতেই বাকতোক্ষণ লাগে? নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গকে ধরিয়ে দেবে!

কিন্তু পালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে···পিছনে একটা হাস্যোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—আরে আমাদের গৌরাঙ্গ গোঁসাই না?···পালাচ্ছেন তো?·· স্বভাব আর বদলালোনা দেখছি।—আসুন আসুন শুনুন!

না চিনতে ভুল হয় না।

সেই আঁট সাঁট জামা পরা মাজাঘসা তরুণী। বিশেষের মধ্যে পরণে গরদের ব্লাউস আর গরদের থান। সঙ্গে গামছা আর ঘটি। পুণ্যার্থিনীর বেশ।

কিছুদিন থেকে ভারী পুণ্যাকাঙ্ক্ষা বেড়েছে অপর্ণার, তাই পাঁজিতে যোগযাগ একটা দেখলেই হলো, ছুটবে স্নানের ঘাটে। বিধবা বৌকে পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা দেবার সাহস শাশুড়ীর নেই।

আর শাশুড়ীতো বিষ হারানো ঢোঁড়া। স্বামী নেই পুত্র নেই, কথার দামই বা থাকবে কি করে তাঁর?

রিক্সাওয়ালাটা ভার সাম্য রাখতে সাইকেলটাকে প্যাডেল করতে থাকে একই জায়গায়। অপর্ণা হাত বাড়িয়ে বলে—আসুন শুনুন···নেহাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠতে বলবোনা, পাড়ার লোকে ভালো চক্ষে দেখবে না, একটু তফাতে থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলুন! বেশী হাঁটতে হবে না, কাছেই বাড়ী।

—আপনার বাড়ী যাবো কেন ?

—কেন ? সে কথা বাড়ী গেলে বলবো, মোটের উপর ছাড়া হবে না আপনাকে। ব্রত সারা হয়ে গেলো আমার, আপনার আসা হলো না—কতো আশা করে বাস্থলডাঙায় লোক পাঠালাম আনতে, শুনলাম আপনি নিরুদ্দেশ। ··· আচ্ছা খেয়ালী মানুষ তো !

সমস্ত কথার মধ্যে একটা কথা গৌরাঙ্গর মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ীর ঘা মারে।

—লোক পাঠিয়েছিলেন বাস্থলডাঙায় !

নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে গৌরাঙ্গর।···কথার সুরে অবিশ্বাস।

—হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ! মিছে কথা বলে আমার লাভ ?

—কোথায় লোক পাঠিয়েছিলেন ?

—বাস্থলডাঙায় শশধর ঘোষালের বাড়ীতে।

—কক্ষনো না। অসম্ভব !

—কী মুস্কিল, আপনি তো আচ্ছা পাগল ! সত্যি মিথ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মীমাংসা হবে না, চলুন লক্ষ্মীটি। ··· একটু তফাতে তফাতে যাবেন, যাতে কারুর নজরে না পড়ে। ··· চেহারার কী হাল করেছেন ! চেনবার উপায় নেই, নেহাৎ আমি তাই চিনলাম। বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যাওয়া বুঝি আপনার স্বভাব ?···উঃ কী নিষ্ঠুর আপনি !...এই রিক্সাওলা, আস্তে আস্তে !

—আমাকে ডেকে এনে আপনার কি লাভ হলো ?

দরজার কাছে এসে প্রশ্ন করে গৌরাঙ্গ। হয়তো ঘুরতে ঘুরতে বর্দ্ধমানে এসে পড়ার মধ্যে কোথায় যেন কিসের একটা প্রত্যাশা ছিলো, তবু এ প্রশ্ন করলো গৌরাঙ্গ।

অপর্ণা মুখ টিপে হেসে বলে—লাভ লোকসান আমি বুঝবো, ঢুকে পড়ুন তাড়াতাড়ি, দেখছেন না আকাশে কি ঘনঘটার আভাস, জোর বৃষ্টি আসছে।

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে দেখে উপর দিকে, তারপর চিন্তিতভাবে বলে—তা হলে কি হবে ?

—কিসের কি হবে ?

—ফেরবার। ··· আমি এখনই যাই।

অপর্ণা খিল খিল করে হেসে উঠে আঁচল খুলে পয়সা নিয়ে রিক্সাওলাটাকে বিদায় করে বলে—এতোদিনের মধ্যে আর কোন নতুন কথা শিখলেন না বৈরিগী ঠাকুর ! সেই 'যাই' আর 'যাই'। তাই বুঝি কেবল ঘর ছেড়ে পালান। এমন পালাই পালাই মন নিয়ে সংসার করতে গিয়েছিলেন কেন ? স্ত্রী পুত্রকে ভাসিয়ে—

কথার শেষাংশটুকুর উপর কান না দিয়ে গৌরাঙ্গ যেন বিরক্তভাবে বলে—ঘর আমি সাধে ছাড়িনি।

কথায় কথায় ততক্ষণে বাড়ীব মধ্যে ঢুকেই পড়েছে এরা।

সেকেলে বনেদি ধরণের মস্ত বাড়ী, কিন্তু কেমন যেন থম্‌থমে নির্জ্জন নির্জ্জন। পুরুষ অভিভাবকবর্জ্জিত বাড়ী, বিধবা শাশুড়ী বৌ আর দু'চারজন বিধবা আশ্রিতা—এই হলো সংসারের সদস্য, আর যা আছে দাস দাসী।

বয়সের ধুলায় মলিন বিবাট উঠোনটার মাঝখানে এসে দাঁড়িযেছে দুজনে, অপর্ণা এদিক ওদিক তাকিয়ে মুখটিপে হেসে বলে—সাধকরে ঘরছাড়া হননি তো ঘরছাড়া করলো কে ? আমি নয়তো !

এই হাসি এই পরিবেশ ভালো লাগেনা গৌবাঙ্গর, তবু ওব সঙ্গে সঙ্গে দালানে ওঠে। তবুতো চারদিকে দেয়াল আছে, চলতে চলতে ফিরে ফিরে দেখতে হবেনা পিছন থেকে কেউ অনুসবণ করছে কিনা।

দালানে পাতা তক্তপোষটার উপর বসতে দিয়ে অপর্ণা ভিতরে ঢুকে যায়, একটা দাসীকে ডেকে বলে এই মানদা শোন, দালানে যাকে বসিয়েছি তাকে হাত মুখ ধোবার জল গামছা দে বুঝলি ! আমার মাসীর বাড়ীব দেশের

পুরুতের ছেলে, মাথাটা একটু ইয়ে, খেয়ালের ঝোঁকে বাড়ী থেকে পালিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াচ্ছে, ঘাটে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এলাম। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কতোকাল খায়নি। চটকরে ওর ব্যবস্থা করে দে, খেতে দিই।

মানদা বেজার মুখে বলে—তাতো বুঝলাম বৌদি। আপনি ওদিকে পথ থেকে মাসীর বাড়ীর কুটুম ধরে আনছেন, আর আমি এদিকে গালমন্দ খেয়ে মরছি।

—কেন তোর আবার গাল খাওয়ার কি হলো?

—ওই যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে চানের ঘাটে যাইনি বলে।

—আমিই তো যেতে মানা করলাম।

—তা' কে শুনছে। মা সেই অবধি বক্‌বক্ করছে—বৌমানুষ একলা ঘাটে যাবে এমন কথাও শুনিনি—

—না শুনেছেন তো শুনুন নতুন কথা। চিরকাল হাত পা বাঁধা হয়ে থাকতে হবে কেন? ···নিজে অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে এসেছেন বলে, আর কেউ কিছু করবেনা? তোকে যা বলছি করগে যা!

—যাই। ··· মানদা একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে স্বগতোক্তি করে চলে যায়—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমাদের হয়েছে সেই উলুখাগড়ার অবস্থা!

—শুদ্দুর বাড়ীতে অন্নগ্রহণে আপত্তি নেইতো ঠাকুর মশাইয়ের?··· চঞ্চল চোখের তারায় হাসির আলো ঠিকরে বলে অপর্ণা—একটা না হয় প্রায়শ্চিত্ত করে নেবেন কি বলুন?

গৌরাঙ্গকে মূক করে রেখে বামুনঠাকরুণকে ভাতের অর্ডার দিতে যায় সে। শুধু তো অর্ডার নয়, ঘুষও দিতে হবে, ব্যাপারটা যাতে শাশুড়ীর কানে না তোলে।

অপর্ণার ঘরের মেজেয় ভাতের থালাটা নামিয়ে রেখে বামুনঠাকরুণ চলে যেতেই গৌরাঙ্গকে প্রায় বসিয়েই দিলো অপর্ণা। লোকটা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়েছিল।

বহুদিন পরে এমন পরিপাটি করে বাড়া সুচারু অন্নব্যঞ্জনের সামনে বসতে পেলো গৌরাঙ্গ। সত্যি, কতোদিন সে পাতা-আসনে বসেনি, বসেনি বাড়া-ভাতের সামনে। কিন্তু সহসা যেন ওর সমস্ত চিত্ত আলোড়িত করে একঝলক জল উপচে পড়লো চোখের কানায় কানায়।

এমনি পরিপাটি করে খেতে দিতো বাসন্তী।

সুধামুখী আর নিভাননী দু'জনেরই কাজের ছিরি সমান, বাসন্তীর হাতেই ছিলো যেন লক্ষ্মীর স্পর্শ। ··· সেই লক্ষ্মীর আজ কি অবস্থা কে জানে! ·· বাড়ীতে তিনটি স্ত্রীলোক আর একটি শিশু। কে ওদের রক্ষা করছে, কে ওদের প্রতিপালন করছে! ··· শশধর যে কি উপার্জ্জন করতো, তা' কোনোদিন ভেবে দেখেনি বটে গৌরাঙ্গ, কিন্তু সে যে এমন বেশী কিছু নয়, এ বোধ তার আছে।

কে জানে কতো যুগ হয়ে গেলো শশধর খুন হয়েছে, আর গৌরাঙ্গ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! এই ছ'মাসে অনেক বয়েস বেড়ে গেছে গৌরাঙ্গর, তাই এতো কথা ভাবতে পারছে ও।

—ওরে বাবা বৃষ্টির কি ছাট্ আসছে—উঠে সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে অপর্ণা ফের বসে বলে—কি হলো, ভাতে হাত দিচ্ছেন না যে? ভয় নেই জাত যাবে না, আমি হাত দিইনি। বামুন ঠাকরুণের রান্না।

—সেজন্যে নয়—আসন্ন বর্ষণ চোখকে কষ্টে সংযত করে গৌরাঙ্গ বলে—আকাশটা বিপদ করলে দেখছি।

—কারো কাছে বিপদ, কারো কাছে সম্পদ—দাসীদের কান বাঁচিয়ে অপর্ণা বলে—এতো জলে তো আর পালাতে পারবেন না ?

—থেকেই বা কি হবে ?

—কি হবে তাই যদি বুঝতে ঠাকুর, তা'হলে কি আর এমন ভাবে ঘর শূন্য করে পালিয়ে বেড়াতে পারো ?

কোন ফাঁকে যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে প্রমোশন হয়, গৌরাঙ্গর খেয়ালে পড়ে না। ও বলে—বলেছি তো কারণ আছে।

—তোমার কারণ তোমার থাক ঠাকুর, আমার বাদলকে একবার আনিয়ে দাও না ?

—বাদলকে ? এখানে ?

—চমকে ওঠার কি আছে, আমি যে তার মাসী হয়েছিলাম সেকথা বুঝি মনে নেই ? ব্রত সারার সময় বাপ ছেলেকে নেমন্তন্ন করে পাঠালাম, আশা করে বসে আছি, ভগ্নদূত ফিরে এলো। বলে—'বাপ নিরুদ্দেশ, ছেলেকে দিদিমা পাঠালো না।'

ভাতে হাত দিতে গিয়ে হাত তুলে নেয় গৌরাঙ্গ, বিস্ফারিত নেত্রে উত্তেজিত স্বরে বলে—গিয়েছিলো ওখানে ? সত্যি গিয়েছিলো ?

—কি মুস্কিল ! সত্যি না তো কি মিথ্যে ?···আমার মাসীকেও আনতে গেলো যে। পাশাপাশি গাঁ বৈ তো নয়।

—দিদিমা পাঠালো না ! আর কেউ ? আর কেউ কিছু বলেনি ?

অপর্ণা মৃদু হেসে বলে—না আর কেউ কিছু বলেনি।··· বলি 'আর কেউ-এর' জন্যে তো টনক নড়ে উঠলো ঠাকুর, তবে আর বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়ানো কেন ? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেই হয়।

কথাটার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গে গৌরাঙ্গর ভিতরটা জ্বলে ওঠে। সেই জ্বালার অভিব্যক্তিস্বরূপই বোধ হয় ক্ষিপ্রহাতে ভাতটা ভেঙে তা'তে ডালের বাটিটা

একেবারে উপুড় করে দিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে ওঠে—তা আর নয়—ঘরের ছেলের ঘরে ফেরবার পথ যে পরিষ্কার করা আছে!…মাথার ওপর যার ফাঁসি কাঠ ঝুলছে, ওয়ারেণ্ট নিয়ে পুলিশে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তার নইলে আর ঘরে ফেরবার মুখ কার আছে!

রাগভরে জোরে জোরে ভাত মাখতে থাকে গৌরাঙ্গ। একটা স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশ পেয়ে নিজস্ব স্বভাব মাথা তুলে ওঠে ওর, ফিরে পায় নিজস্ব বাচনভঙ্গী।

কিন্তু এই নিজস্বতা যে সর্পাঘাতের মতো শিউরে তোলে অপর্ণাকে।

'ফাঁসি, ওয়ারেণ্ট'এর মানে কি? কালিমাড়া মুখে জিজ্ঞেস করে অপর্ণা—এ সব কথার মানে কি ঠাকুর?

—মানে তো কচি ছেলেটাও বুঝবে।…বলি আপনার যে লোক বাসুল-ডাঙায় গিয়েছিলো তা'র সঙ্গে শশধর ঘোষালের দেখা হয়েছিলো? বলুন একবার 'হয়েছিলো'।

অপর্ণার সঙ্গে যেন যুদ্ধ আহ্বান করছে গৌরাঙ্গ।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলে—না তা হয়নি, দিদিমা নাকি বলেছিলো ছেলে আমরা পাঠাতে পারবো না বাছা, মাপ করতে হবে—। তা' এর সঙ্গে ওসব কথার সম্পর্ক কি?

গৌরাঙ্গ যেন অপর্ণার নির্বুদ্ধিতায় চটে গেছে, চটে গেছে ওর বাচালতায়, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে—তা' সম্পর্ক থাকবে কেন! হি হি করে হাসলেই সব হয়ে গেলো! শশধর ঘোষাল খুন হলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর একটা লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো, এ কথার মানে বোঝবার বয়েস হয়নি কেমন?

—খুন হলো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ! খুন হলো। জেনে শুনে ন্যাকা সাজা দেখলে রাগ চড়ে যায়

আমার। বাসুলডাঙায় যখন লোক গেছে, জানতে কিছু বাকী আছে না কি? চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না ফেরারি আসামী? পুলিশে যদি টের পেয়ে থাকে এই বাড়ীতে এসে সেঁধিয়েছি, তা হলে—

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে অপর্ণা, শিউরে নীল হয়ে যায়। সর্ব্বনেশে লোকটা বলে কি! এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো দরাজ গলায় বলে যাচ্ছে, খেয়াল নেই এ থেকে কী বিপদ হতে পারে! পুলিশ এসে হানা দিলে শুধু কি গৌরাঙ্গর অপকীর্ত্তিই প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেই সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়বে না অপর্ণার সমস্ত মিথ্যা ভাষণ? ... আর সে প্রকাশ হওয়ার অর্থ যে কি সে কথা অপর্ণা বোঝে না কি? তবে মায়া মমতা দেখাতে যাবে কোন সাহসে? আর কেনই বা দেখাবে, কাকে করবে মমতা? নিজে মুখে যে স্বীকার করছে সে খুনী আসামী, তাকে?

খুনী!

একটা মানুষকে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা!

উঃ এই লোককে ডেকে এনে আদর করে খাওয়াতে বসিয়েছে অপর্ণা। ...কে জানতো এ এতোবড়ো সর্ব্বনেশে লোক! ... নেহাৎ গান শুনে বড়ো ভালো লেগেছিলো বলেই না এতো আগ্রহ দেখিয়েছে অপর্ণা, নইলে একটা পথের ভিখিরির মতো লোককে বাড়ীতে ডেকে আনে সে? বৈষ্ণব ভিখিরিকেও তো ডেকে বসানো হয়, সেই মনোভাব নিয়েই না অপর্ণা—

এক মুহূর্ত্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের এমন বহু যুক্তিই মনের মধ্যে খেলা করে যায় অপর্ণার, তাই 'তুমি' আবার রূপান্তরিত হয়ে যায় 'আপনি'তে।

আঘাতটা বড়ো আকস্মিক হয়ে গেছে বলেই রাগে দিশেহারা হয়ে ওঠে সে, তীব্র আর তীক্ষ্ণ স্বরকে যতোটা সম্ভব খাদে নামিয়ে বলে—আপনি কি আমার সর্ব্বনাশ করতে চান? যান একখুনি বেরিয়ে যান।

—যাচ্ছি। সেধে ডেকে আনতে তো বলিনি—বলেই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় গৌরাঙ্গ।

আর ওঠার পরে তাকিয়ে দেখে হুঁস্ হয় অপর্ণার, প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই উঠে পড়েছে গৌরাঙ্গ।

বোধকরি একটু বিচলিত হয় অপর্ণা, একটু দুর্ব্বল স্বরে বলতে চেষ্টা করে 'আহার ছেড়ে উঠে পড়তে' সে বলেনি, কিন্তু মুখে আটকায়, চক্ষুলজ্জায় বাধে। আর তা'র সৎ ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে দিতেই বুঝি মানদা ছুটে এসে বলে—অ বৌদিদি দেখোসে তোমার কাকা না কে যেন এসেছে।

—কাকা! এই দুর্য্যোগে! বলিস কি? কাকা—

—হ্যাঁ গো, কলকেতা থেকে এসেছে, মেয়ের বে'র নেমন্তন্ন করতে না কি! ভিজে একেবারে নেয়ে গেছে! আপনি এখানে উন্মত্ত হযে রয়েছো, ওদিকে মা রেগে রসাতল করছে। ·· মানদা যেমন ঝড়ের মতো আসে তেমনি ছুটে বেরিয়ে যায়।

নাঃ মমতা করবার সময় নেই, চক্ষুলজ্জার অবসব নেই, অপর্ণা প্রায় ঠেলেই দরজার কাছে এনে ফেলে গৌরাঙ্গকে। সামনের দরজা নয়, পাশ দরজা।

বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় গৌবাঙ্গ। যতো দুঃসময়ই হোক, তবু মুষলধারে বৃষ্টির নীচে ইচ্ছে করে মাথাটা বাড়িয়ে দিতে বোধ কবি একটু ইতস্ততঃ না করে পারে না মানুষ। ·· আবার মানুষে পারে না এমন কাজও বোধ করি জগতে নেই। ·· তাই চোরাই মাল গোপন করতে চোর যে ভাবে কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জ্জন দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই অপর্ণা ব্যাকুল চাপা গলায় ধমকে ওঠে—ইতস্ততঃ করে কি হবে, এ বিষ্টি কি সহজে থামবে?·· তবু দাঁড়াচ্ছেন? আপনি কি আমার হাতে দড়ি না পরিয়ে ছাড়বেন না? না পাঁচ জনের সামনে মুখে চুনকালি দেবেন? আমার কাকা পুলিশের ইনিস্‌পেকটার তা' জানেন?

নাঃ আর কিছু জানবার নেই, বজ্রপাতের নীচেও মাথা পেতে দিতে দ্বিধা নেই আর! ···মুহূর্ত্তে সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় গৌরাঙ্গ।

বাসুলডাঙার শশধর ঘোষালের হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াবার দায় কলকাতার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বসন্ত মিত্তিরের আছে কি না, অথবা থাকা সম্ভব কি না, এ বোধ হু'জনের একজনেরও নেই। ··· অপর্ণা বরং ভাবে মেয়ের বিয়েটা ছল।

উন্মাদের মতো অস্থির হয়ে ওকে তাড়িয়ে দিয়েই হঠাৎ যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে অপর্ণা···খোলা দরজাটার কপাট ধরে শিথিল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে। মুখের ভাত ফেলে চলে গেলো লোকটা—এতো নিষ্ঠুর অপর্ণা, এতো হৃদয়হীন! আচ্ছা ও কি সত্যি খুন করে এসেছে, না কি পাগল হয়ে গিয়েছে ও, তাই খেয়ালের বশে যা খুসি বলেছে!

কিন্তু অপর্ণা তো পাগল নয়, সে কেন ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে আনতে গেল! কিসের স্পর্দ্ধায, কোন হুঃসাহসে? এই তিন মহলা প্রাসাদটার আইনতঃ অধিকারিণী না কি অপর্ণাই, কিন্তু এর কানাচের এককোণে এতোটুকু আশ্রয কাউকে দেবার অধিকার কি অপর্ণার আছে? এ জগতে অপর্ণার নিজের আশ্রয় কোথায় আছে? কোথায আছে জোর?

মানুষের চাইতে বুঝি জন্তুও ভালো।

একটা পড়ো বাড়ীর ভাঙা গহ্বরে বসে, বর্ষণক্লান্ত মেঘমেহুর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে এই দার্শনিক চিন্তাটি করছিলো গৌরাঙ্গ। ··· এই

পড়ো বাড়ীটার প্রথম আগন্তুক ছিলো একটা বৃষ্টিতে ভেজা কুকুর। দুটো পায়ের মাঝখানে মাথাটা গুঁজে ঝিমোচ্ছিলো।

গৌরাঙ্গ যখন ঢুকেছে, ও অলস দৃষ্টি মেলে একবার দেখে নিয়েই চোখ বুজেছে, কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর থেকে দু'জনে স্থির হয়ে বসে আছে একই আচ্ছাদনের নীচে, কিন্তু বিরোধ ওঠেনি কোনো পক্ষ থেকেই।

—ধুত্তোর, ছাই পৃথিবী!

উদাসীন লোকটার স্তিমিত চোখে হঠাৎ যেন স্থির সংকল্পের আগুন জ্বলে ওঠে—এই হতচ্ছাড়া পৃথিবীটাতে পড়ে থাকবার জন্যে এতো চেষ্টা, এতো ঝুলোঝুলি! দূর দূর!

নাঃ এমন করে আর প্রাণ নিয়ে পালিযে বেড়াবে না সে, শশধরের হত্যাকারীকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে তবে ছাড়বে।

অপর্ণার হৃদয়হীনতা যেন তার মূর্চ্ছিত চৈতন্যকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে দিয়ে গেছে। ··· এই গত ছয়মাসব্যাপী নিজের অস্নাত অভুক্ত আতঙ্কগ্রস্ত পালিয়ে বেড়ানো দীনমূর্ত্তি স্মরণ করে নিজেরই যেন ঘৃণা ধরে যাচ্ছে তার!

শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে এই দীনতা! এর কোনো অর্থ আছে? ··· জেগে থাকলে শুধু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে আপনাকে লুকিয়ে রেখে রেখে দিনটাকে ক্ষয় করা ··· আর ঘুমোবার সুযোগ জুটলেই দুঃস্বপ্ন দিয়ে সে ঘুমের সুরু।··· ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন! ··· মাথার উপবে চক্‌চকে একটা ধারালো অস্ত্র, আর পায়ের নীচে খানিকটা কালো রক্তের ধারা!

এখনো ভালো করে বুঝতে পারে না গৌরাঙ্গ, কার হাতে কে খুন হয়েছিলো সেদিন! ···শশধর খুন হয়েছিলো আর গৌরাঙ্গ বেঁচে আছে?

মাঝে মাঝে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে গৌরাঙ্গ, নিজে সে ঠিক মতো বেঁচে আছে কি না ?

'বেঁচে আছি' কি না অনুভব করতে চিম্‌টি কেটে কেটে প্রমাণ নেওয়া এমন ঘৃণ্য জীবন বয়ে বেড়ানোর শেষ হোক এবার।

হয়তো এমনিই হয়।

মানুষের হৃদয়হীনতাই মানুষকে উদাসীন করে তোলে, দার্শনিক করে তোলে। ··· মানুষের হৃদয়হীনতা শিশুকে প্রবীণ করে, নির্বোধকে বিজ্ঞ করে। অপর্ণার আজকের হৃদয়হীনতা গৌরাঙ্গর জড়ত্বপ্রাপ্ত মনকে দিয়ে গেছে চিন্তাশক্তি। ··· গৌরাঙ্গর উপকার করেছে অপর্ণা।

তাই—'ধূত্তোর ছাই পৃথিবী' বলে উঠে দাঁড়ালো গৌরাঙ্গ।

কি ভেবে কুকুরটাকে একটু আদর করলো, তারপর পড়ো বাড়ীর ভাঙা ইঁটের স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

মৌন আকাশ মেঘমলিন, বাতাসে এখনো আর্দ্রতা, প্রচুর বর্ষণসিক্ত মাটির স্পর্শ লেগে সে বাতাস যেন আরো ভাবী হয়ে উঠেছে।

চলতে চলতে সমস্ত প্রকৃতিটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো চলন্ত পথিক, আর একবার অবাক হয়ে ভাবলো···এই পৃথিবীতে দু'টোদিন বেশী থেকে যাবার জন্য মানুষের এতো মাথা কোটাকুটি !···আশ্চর্য্য !

কিন্তু ক'দিনেরই বা কথা, যেদিন সে এমনি একা চলতে চলতে ভেবেছিলো...এই পৃথিবী, এই আলো, এই বাতাস এর মাঝখানে মানুষ আনন্দ খুঁজে পায়না কেন ?

সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো।...

শূন্য লাইনটা যেন সদ্য বিধবার সিঁথির মতো পড়ে রইলো দর্শকের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলতে। ট্রেন ছেড়ে দেবাব পর ইঞ্জিনের শব্দ যখন শেষ হয়ে যায়, শূন্য লাইনটা দেখে মনটা উদাস উদাস হয়ে যায়না এমন কেউ আছে?

বাসুলডাঙা স্টেশনে আধ মিনিট ট্রেন থামে।

দিনে রাতে দু'বার ওর ডিউটি। রাত চারটে আর বেলা চারটেয় আধ মিনিট করে এখানে থেমে আবার নিজের মদগর্ব্বিত চালটি বজায় রেখে অগ্রসর হয়ে যায় সে। দিনের গাড়ীটায় কোনদিন দু'চারজন ওঠে নামে, রাতের গাড়ীটায় লোক আসা যাওযা দৈবাতের ঘটনা।

তবু বাসুলডাঙা ষ্টেশনে ট্রেন আধ মিনিট থামে।

তবু শেষ রাতের ট্রেনটা চলে যাওয়ার পরই ষ্টেশন মাষ্টারমশাই রেল কোম্পানীর চারদিকে কাঁচ বসানো চৌকো আর ভারী একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরে কাকে যেন খুঁজে বেড়ান। দেখা জায়গা আবার দেখেন মনে হয় অসতর্কে চোখ এড়িয়ে গেছে বুঝি ··· ঝুমকো জবার ছায়াটাকে বারবাব মানুষ বলে ভুল করেন।

···খুঁজতে· খুঁজতে ভোরেব আলো ফুটে ওঠে ... পৃথিবী তার সমস্ত রহস্য হারিয়ে ফেলে। লণ্ঠনটাকে নিভিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু তার সঙ্গেই কি নিভে যায় সমস্ত আশার আলো? সব প্রতীক্ষার শেষ হয়ে যায়?

না, না বিকেল চারটের ট্রেন আসবার সময় যে বাদলকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

এই এক নতুন ডিউটি হয়েছে মাষ্টারবাবুর।

বেলা তিনটে না বাজতেই বাদলকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে আসা, তারপর মিনিটের পর মিনিট দু'টি অসমবয়সী বন্ধুর একই ব্যর্থ আশার দুঃসহ প্রতীক্ষা। দূর থেকে সিটির শব্দ শোনা যায়···প্লাটফরমটা যেন কেঁপে ওঠে, ইঞ্জিনটা চোখ থেকে সরে যায়, দেখা দেয় ট্রেনের কামরা! ··· চির পুরাতন তবু নিত্যনতুন! ··· নিত্য নতুন আশার বাহক।

'হয়তো আজ আসবে'! 'হয়তো আজ আসতে পারে'!

ট্রেন আসার আগে পর্য্যন্ত কথার খই ফোটে নবীন আর প্রবীণ দু'টি বক্তার মুখে। দু'জনেই বক্তা দু'জনেই শ্রোতা।

ঝুমকো জবায় হাত ভর্ত্তি হয়ে যায়,···ছোট্ট ছোট্ট মসৃণ নুড়ি পাথরে পকেট ভারী হয়ে ওঠে।·· বাবা হঠাৎ এসে পড়লে চট্ করে কি উপহার তার হাতে তুলে দেওয়া যাবে ভেবে ঠিক করতে পারেনা বলেই বাদলের এই সংগ্রহ। হাতে সময় বেশী থাকলে দু'জনে একটু জুৎ করে পাথর কুচির স্তূপের উপর বসে ·· হয়তো বাদল অভিযোগের ভঙ্গিতে বলে —

—'পালা' গুলো সব পুড়িয়ে ফেললে জ্যাঠাবাবু, বাবা এলে কি বলবে?

—বাবা এলে? আমার নদের গোরা নদেয় ফিরলে? মাষ্টারমশাই বিচলিত কণ্ঠের উপর চেষ্টাকৃত জোর এনে বলেন—বলবো—বেশ করেছি—সব পুড়িয়ে ফেলেছি, তুই হতভাগা মুখ্যু গাধা চলে গেলি কেন?

—বাবাকে তুমি বকবে জ্যাঠাবাবু?

—বকবোনা? ···একশোবার বকবো হাজারবার বকবো। হতভাগা লক্ষীছাড়া আমাকে এই কষ্টটা দিচ্ছে, আর আমি তাকে বকবোনা!

বাদল একটু চুপ করে থেকে ম্রিয়মাণভাবে বলে—আমারও তো বাবার জন্য কষ্ট হয় জ্যাঠাবাবু!

—বকবি, তুইও বকবি—

পিতলের বোতাম আঁটা মোটা কাপড়ের কোটের হাতাটা বারবার চোখের কাছে ওঠে—আচ্ছা করে বকে দিবি।

—ককখনো না। ··· বাদল সতেজ উত্তর দেয় — একটুও বকবো না! আমি বাবাকে, শুধু ভালবাসবো।

—ঠিক বলেছিস বাবা, ঠিক বলেছিস। 'শুধু ভালবাসবি'। তুই যে শিশু তুই যে দেবতা মাণিক, তুইতো আমাদের মতো স্বার্থপর নয়! ··· 'শুধু ভালোবাসবি' 'শুধু ভালোবাসবি' ঠিক বলেছিস!

মনের আবেগে দাঁড়িয়ে ওঠেন মাষ্টার মশাই। উঠে পড়ে পায়চারি করতে থাকেন।···একটু পরেই হয়তো বাদল অন্য কথার অবতারণা করে—আচ্ছা জ্যেঠাবাবু, তুমি যে বলেছিলে খবরের কাগজে বাবার নামে চিঠি ছাপিয়ে দিয়েছো, কতোদিন হয়ে গেলো—কই তার উত্তুর এলো না তো?

মাষ্টার মশাই ভগ্নস্বরে বলেন—আসবেরে বাদল আসবে। সেই উত্তুরের আশাতেই তো এমনি করে দিন গুনছি বাবা!

—যে কাগজটায় চিঠি ছেপেছিলে জ্যেঠাবাবু, মামীমা সেটা রোজ পড়ে।

—অ্যাঁ রোজ পড়ে, মামীমা রোজ পড়ে? আর তোর মা?

—মা? মা বুঝি পড়তে জানে?···হঠাৎ হেসে ওঠে বাদল—মা এমন বোকা জ্যেঠাবাবু, তুমি যে সেই ছবিটা দিয়েছিলে তার নীচেয় তো পষ্ট করে লেখা রয়েছে "ভীষ্মের শরশয্যা"...মা বলে কি অমন মাটিতে কাঁটা পুঁতে পুঁতে তার ওপর শুয়েছে কেনরে বুড়োটা?...গাজনের সন্নিসী বুঝি?

মাষ্টারবাবুর একঝুড়ি কাঁচা পাকা গোঁফের অন্তরালেও নিষ্প্রভ একটু হাসি উঁকি মারে।

দূরে সিটি বেজে ওঠে।

দু'জনেই সচকিত হয়ে এগিয়ে যায়—মাষ্টার বাবুর নিজস্ব কিছু ডিউটি আছে...বলেন—বাদল একটু দাঁড়া, আসছি। ...খুব নজর রাখবি, কড়া নজর! কেউ যেন নেমে এদিক ওদিক পালিয়ে যায় না।

যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি ঘুরে এসে আবার বাসুলডাঙা ষ্টেশনে নামবে, সে ফের কেন পালিয়ে যাবে এ বিচার নেই মষ্টারমশাইয়ের কাছে।...তাঁর খালি দুর্ভাবনা পলাতক খেয়ালীটা হাতে ধরা দিয়ে আবার যদি পালায়।

ট্রেণ 'ইন্' করলে খাতায় সই করতে হবে ষ্টেশন মাষ্টারকে, আবার অর্ডার দিতে হবে 'পাশ' করবার। ও একটা নিয়মমাত্র। বাসুলডাঙা ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের পরিশ্রম, তাঁর পারিশ্রমিকের সঙ্গে ভারসাম্য রেখেই চলে।

ট্রেণ আসে, আধ মিনিট থামে, আবার সিটি দিয়ে চলে যায়। ...

পড়ে থাকে একটা বিরাট রিক্ততা।

—বাবা আর আসবে না জ্যেঠাবাবু!

হতাশ শিশুচিত্ত থেকে একটা গুমরোনো নিশ্বাসের মতোই উচ্চারিত হয় কথাটা—বাবা আর কোনোদিনও আসবে না।

শিউরে ওঠে শ্রোতার প্রাণ! ...সভয়ে শিশুর মুখে একটা হাত চাপা দেন মাষ্টারমশাই, এ বুঝি বা আপন হৃদয়ের আশঙ্কাকেই চাপা দেওয়া!

—খবরদার ওকথা মুখে আনিসনি বাদল! খবরদার না। আসবে বৈকি নিশ্চয় আসবে, না এসে সে যাবে কোথায়?

আর কথা হয় না...বোবা দুটি প্রাণী ফিরতে থাকে গ্রামের দিকে। বাদলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আবার স্টেশনে ফিরবেন মাষ্টারবাবু দীর্ঘ পথ ভেঙে!

আসার সময় তবু একটা শিশুর সঙ্গ থাকে···থাকে তা'র পৃথিবীতে নতুন আসা কোমল হাতের স্পর্শ, থাকে অপরাহ্নের সোনালী আলো—ফেরার সময় সবটাই অন্ধকার।

তবু আবার···ঘণ্টা কতক পরেই অন্ধকারের মাঝখানে একটা আলো উঁচু করে ধরে বারেবারে একই জায়গায় খুঁজে খুঁজে বেড়াবেন মাষ্টার, যদি তাঁর চোখ এড়িয়ে কেউ ট্রেনের কামরা থেকে নেমে পড়ে থাকে!

—জামাইয়ের কোনো খবর পেলে না শশধরের মা? পুকুরঘাটের মজলিশে এ প্রশ্নবাণ নিভাননীর নিত্য বরাদ্দ।

হাতের ঘড়াটাকে অযথা জোর দিয়ে মাজতে মাজতে নিভাননী বলেন—কই আর?

—তা' তোমরা বাপু তেমন জোর তলবে খুঁজছোও না ভাই। যতোই হো'ক মেয়েটার পানে তো চাইতে হবে!···নাতিও তো তোমার খুব 'বাপ-ন্যাওটা' ছিলো, বাপ নিরুদ্দিশ হওয়া অবধি ছেলেটা যেন কালীবর্ণ হয়ে গেছে। ···একটু চেষ্টা চরিত্তির তোমাদের করা উচিত।

নিভাননী ঘড়াটাকে দুম্ করে ঘাটের একধারে বসিয়ে বেজার মুখে বলেন—পাড়ায় যখন তা'র হিতৃষীর অভাব নেই, চেষ্টা চরিত্তির করলেই পারে। আমার যা ক্ষ্যামতা তা'র বেশী আর কোথ্‌থেকে হবে? ···অপরা ততোক্ষণে আর এক প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন।

—হ্যাঁ গা, শ্যালা ভগ্নিপতিতে ঝগড়াটা হলো কেন, তার আর ফয়সালা হলো না?

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর শীতলত্ব প্রাপ্ত হয় না, ছ'মাসের ঝড় বৃষ্টি রোদ বাতাসের ঝাপটেও ম্লান হয়ে যায় না, একটির পর একটি দিনরাত্রির প্রলেপ পড়ে পড়েও ঢাকা পড়ে না।

ঘোষাল বাড়ীর রক্তপাতের ইতিহাস আর নিরুদ্দেশের ইতিহাস স্পষ্ট করে জানবার জন্যে আগ্রহের আর শেষ হলো না তা'দের। হবেই বা কেন, গৌরাঙ্গ না ফেরা পর্য্যন্ত ওদের কৌতূহল ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অবসর পাচ্ছে না যে।

মনের দুঃখে পাড়া বেড়ানো ছেড়েছে সুধা, যখন তখন 'ঠাকুর দোরে' গিয়ে বসা ছেড়েছেন নিভাননী।

নিভাননী চলে যান, পুকুরঘাট মুখর হয়ে ওঠে তাঁর বাড়ীর আলোচনায়। অনেক দিনের নিস্তরঙ্গ জলে পড়েছে একটি ঢিল, তা'র তরঙ্গকে সহজে থেমে যেতে দিতে রাজী নয় কেউ।

ওদেরই বা দোষ কি ?

এখানে যে কখনো কোথাও কোনো ঘটনাই ঘটে না। ···জন্ম মৃত্যু বিয়ে সে একেবারে অতি পরিচিত ঘরোয়া ঘটনা। এর মাঝখানে একমাত্র উৎসাহোদ্দীপক ব্যাপার কারো সংসারের কোনো 'কেলেঙ্কারীর' আভাস। সে কথা আগুনের শিখার মতো এক রসনা থেকে আর এক রসনায় সঞ্চারিত হয়, আবার সে আগুনে নীরস রসনা সরস হয়ে ওঠে, সে প্রসঙ্গে স্তিমিত চিত্ত উল্লসিত হয়ে ওঠে।

আর নিভাননীকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করার মধ্যেও কি কম আনন্দ ? —একজনকে কিছু অপদস্থ করতে পারলাম এর চাইতে সুখ আর কি আছে ?

বাড়ী ফিরে বাদল দাওয়ায় মাদুর পেতে সামনে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে পড়তে বসে। পড়ায় তা'র অসম্ভব ঝোঁক, যতোই মন খারাপ থাক, পড়ায়

অবহেলা হয় না। শুধু মাঝে মাঝে চোখটা কেমন জলে ভরে আসে, বইয়ের পাতা ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, তখন চোখ তুলে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে সামনের গাছপালার অরণ্যে—অন্ধকার উঠোনটার দিকে। ···

এক এক সময় বইটা মুড়ে রেখে সরে আসে অন্ধকারের আরো কাছাকাছি, বসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে···কি যে ভাবে ছেলেটা কে জানে! হয় তো বাপের কথা, হয় তো তাও নয়।

এতোদিন বাবা ছিলো, কতো কথা কয়েছে বাদল বাপের সঙ্গে, কিন্তু আশ্চর্য্য, আলাদা করে একটা কথাও মনে পড়ে না কেন! কথা মনে পড়লেই সোনাডাঙা থেকে আসার পথে গরুর গাড়ীতে বসে বাপের সেই পরিহাসদীপ্ত মুখ আর বাদলকে রাগানোর কথাগুলোই মনে পড়ে শুধু।

—'বাদলের এখন ইচ্ছে করছে নতুন মাসীর কাছে থাকবে পেটভরে রসোগোল্লা খাবে, জরিপাড় ধুতি নেবে, সিল্কের পাঞ্জাবী নেবে, না রে বাদল ?'

নতুন মাসী নাকি একবার লোক পাঠিয়েছিলো বাদলকে নিয়ে যেতে, বাদল দেখেনি, পাঠশালা থেকে এসে শুনেছিলো। দিদিমা সে লোককে তখন ভাগিয়ে দিয়েছে।

কে জানে নতুন মাসীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে বাবাকে খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় হতো কিনা। ওরা নাকি অনেক বড়লোক। বড়লোক মানেই তো যাদের অনেক অনেক টাকা থাকে, আর টাকা থাকা মানেই যে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই আয়ত্তে থাকা, একথা এই সংসারজ্ঞানহীন শিশুটাও বোঝে।

বাসন্তী পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে মাথাটা নাড়া দিয়ে বলে—আয় বাদল খাবি আয়!

আকস্মিক স্পর্শে বাদল একবার চমকে ওঠে, তারপর স্থিরভাবে বলে—এখন খাবো না, পরে খাবো।

—ওমা, আর কতো পরে খাবিরে—বাচ্চা মানুষটি ? ছোট্ট ছেলে বেশী রাত্তির করে খেলে পেটের মধ্যে পাখী ডাকে জানিস তো ?

—ওসব তোমার বানানো কথা—বাদল গোঁ ভরে বলে।

—বেশ বানানো কথা তো বানানো কথা। সত্যি যেদিন ডাকবে বুঝবি সেদিন মজা।

—খেলে গল্প বলবে ? নতুনগল্প !

—ওরে বাবা, নতুন গল্প আর কোথায় পাবো বল, আমার সব গল্পই যে পুরনো হয়ে গেছে।

বাসন্তী মৃদু হাসে আর বলে।

—স—ব গল্প পুবনো হযে গেছে ? সম—স্ত ?

—সমস্ত !

—বাবা অনেক নতুন গল্প শিখে আসবে না মামী ? এত্তো—দিন ধরে কতো নতুন নতুন বাড়ীতে বেড়াচ্ছে, কতো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে, না মামী ?

—হচ্ছে বৈ কি বাবা !

— জ্যেঠাবাবু বলে—বাবা এলে খুব বকবে !

—সে কথা তো আমিও বলিরে ! আচ্ছা করে বকবো।

বাদল চুপ হয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে খেতে থাকে। সকলেই বলে বাবা এলে বকবে! ··· আশ্চর্য্য ! ওদের মনের বাতাস বাদল ধরতে পারেনা। ··· অনেক দিনেব অনেক প্রতীক্ষার শেষে যে এলো, যার পায়ে পড়ে ধূলো মাখতে ইচ্ছে করবে, তাকে লোকে বকবে কেমন করে ?

বড়োদের অনেক কিছুই বড়ো অদ্ভুত !

বাম্বুলডাঙা থানার সামনে একটা লোক এসে মহা ঝামেলা বাধিয়েছে, বলে 'দারোগার সঙ্গে দেখা করবো'।

লোকটার খালি পা রুক্ষ মাথা, গায়ে একটা ছেঁড়া ছিটের সার্ট, পরণের কাপড়ও তথৈবচ। দরজার পাহারাদার পুলিশ তাড়া দিয়ে তাড়াতে পারছে না তাকে। লোকটার নাকি দারোগাকে চাইই চাই।

থানা মানে বিরাট একটা তিন মহলা প্রাসাদ নয়, একতলা একটু ছাউনী। ইন্‌চার্জ গোবর্দ্ধন গড়াই তারই অন্তরালে নিবিষ্টচিত্তে একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস গলাধঃকরণ করছিলেন, চেঁচামেচি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে হাঁক পাড়েন—কে ওখানে!

চাপরাশী দু'কড়ি দাস অকুস্থল দেখে এসেছে, সে অগ্রাহ্যভরে বলে—ও কিছু না, একটা পাগলা ঝামেলা করছে হুজুর।

—দু'ঘা দিয়ে দিতে বলগে যা।

—আজ্ঞে ইয়ে, তেমন পাগল নয় হুজুর, ভদ্রলোকের ছেলে মনে হচ্ছে।

—'পাগল' অথচ 'তেমন পাগল নয়' এটা কি ধরনের কথা হলো হে দু'কড়ি?

—ওই তো কথা হুজুর—দু'কড়ি মাথা চুলকোতে থাকে।

—লোকটা বলে কি?

—আজ্ঞে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

গোবর্দ্ধন বোধকরি অনেকক্ষণ ধরে হলদেটে কাগজে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা ডিটেকটিভ বইটা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই এই নতুন আলোচনায় চাঙ্গা হয়ে বসেন।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ? বটে নাকি ! ব্যাটার আস্থাতো কম নয় ! শুনগে দিকি কি বলতে চায়।

হু'কড়ি ঘুরে এসে বলে—আজ্ঞে বলছে আপনার কাছে একটা আর্জি আছে, দয়া করে যদি তাকে হুজুরে হাজির হতে আদেশ দেন।

—আচ্ছা, বেটাকে নিয়ে আয় দেখি।

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা যাদের রীতি, ' নিয়ে আয় ' বললেই যে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসবে এটা বিচিত্র নয। পাগলা লোকটা যতোই হাত জোড় করে বলে—'ঠেলছো কেন ভাই, নিজেই তো যাচ্ছি আমি'—হু'কড়ি ততোই ধাক্কা মারে।

গোবর্দ্ধন গড়াই টেবিলের উপর পা তুলে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, লোকটাকে দেখে মুখের বিড়িটা হাতে নিযে গুরুগম্ভীর চালে বলেন—গোলমাল করছিলে কেন ?

—আজ্ঞে আমি তো গোলমাল কবিনি, গোলমাল আপনার চৌকি-দারেরাই করছিলো !

—বটে !

—হ্যাঁ দারোগা সাহেব, এককথায় আপনাব সঙ্গে দেখা করতে দিলেই মিটে যেতো।

—হুঁ ! আমার সঙ্গে দেখা করার দরকাবটা কি হে ? চাও কি ?

লোকটা একটু ঢোক গিলে নিয়ে বলে ওঠে—আজ্ঞে ফাঁসি হতে চাই !

হু'কড়ি মনিবেব সম্মান রক্ষার্থে উচ্চহাসির বদলে মুখ ফিরিয়ে খুক্‌খুক্ করে হাসে। আর মনিব গোবর্দ্ধন গড়াই হা হা করে হেসে ওঠেন।

লোকটা অবাক হয়ে বোধকরি দারোগার বিরাট ভুঁড়ির কাঁপুনি

দেখতে থাকে।··· খানিক পরে কাঁপুনি থামে। দারোগা বলেন—এ ব্যামো কতোদিন হয়েছে হে?

—আজ্ঞে কি বলছেন?

—বলছি—মাথার ব্যামোটি কতোদিন স্বজন হয়েছে?

—বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু মাথার ব্যামো নয়। মাথার যন্ত্রনা বলতে পারেন বরং।··· আমি খুন করেছি হুজুর, ফাঁসিতে ঝুলতে চাই।

দারোগা ওকে বদ্ধ পাগল ভেবেই একটু মুচকি হেসে বলেন—তোমার প্রার্থনাটি মন্দ নয় হে। বেশ ইন্টারেষ্টিং লাগছে।···ওরে দু'কড়ি, যা এনাকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিগে যা, বামুনের ছেলের বাসনা মিটে যাক।

—আহা আপনি দয়া করে আমার কথাটাই শুনুন না। খুন আমি করেছি সেই চণ্ডীর মেলার সময় বুঝলেন, তখন ঝোঁকের মাথায় ছুট মেরে গেলাম পালিয়ে, কিন্তু আর পারছিনা হুজুর। পালিয়ে পালিয়ে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। চোখ বুজলেই রক্ত দেখি, ফাঁসি ছাড়া আমার নিস্তার নেই।

গোবর্দ্ধন গড়াই বোধ করি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলেন—হুঁ, খুনটা করেছিলে কোথায়?

—আজ্ঞে এই বাস্থুলডাঙাতেই—

—বাস্থুলডাঙায়! ফোঃ! আমার এলাকায় খুন হলো, আর আমি টের পেলাম না? ···যাও যাও ঝামেলা কোরো না।

নিজের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেন গোবর্দ্ধন গড়াই।

ভেবেছিলেন পাগল নাচিয়ে খানিকটা সময় কাটবে, তেমন জুৎ হলো না। লোকটা ঠিক পুরো পাগলের মতোও নয়।

—আপনি দয়া না করলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে দারোগাবাবু। শীগগির আমায় ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করুন।

—আঃ, এ তো বড়ো ঝামেলা করলো! ··· নাম কি তোমার?

—নাম ! আমার নাম! ওঃ, নাম গৌরাঙ্গ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য !

যেন বিস্মৃতির গহ্বর থেকে নামটা তুলে আনে গৌরাঙ্গ।

—বটে ! বেড়ে বাহারি নামটা তো ? ···হঠাৎ খুন করার সখ হলো কেন বলো তো হে ?

লোকটা নিঃশব্দে একবার কপালে হাত ঠেকালো।

আর পিছন হতে ছ'কড়ি তার ক্যারিকেচার করলো।

গোবর্দ্ধন গড়াই জ্বলন্ত বিড়িটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে ওঠেন—খুন! হুঁঃ ! আমার থানায খুন হলো, আব আমি টের পেলাম না ! গোবর্দ্ধন গড়াই ঘুমন্ত বেড়াল নয হে, জ্যান্ত বাঘ ! এ থানার প্রত্যেকটি খবর গড়াইযের নখদর্পণে বুঝলে ?

—আজ্ঞে খুব সম্ভব সংবাদ গোপন করেছে!···এ গাঁযেব শশধর ঘোষালকে খুন করে ফেরার হযেছিলাম আমি।

গোবর্দ্ধন এবাব সোজা হযে বসেন, চোখে মুখে একটা ব্যঙ্গের ইসারা করে বলেন—কি হযেছে ? কি নাম বললে ? শশধর ঘোষাল !

হঠাৎ স্থিরতার বাঁধ ভেঙে যায় লোকটার, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলে—তিনি আমার বড়ো ভাইযের মতো ছিলেন দারোগা বাবু, আমাকে খাইয়েছেন পরিযেছেন, আশ্রয দিযেছেন, আব আমি তাঁকে—এ ঘৃণিত জীবন বযে বেড়াবাব ইচ্ছে আব নেই দারোগা বাবু।

গোবর্দ্ধন গড়াইয়েব বোধ করি একটু করুণা হয, তাই ব্যঙ্গভাব ছেড়ে বলেন—দেখো হে বাপু, আমি তোমায় ভালো পরামর্শ দিই শোন, একটা কবরেজেব কাছে যাও। একটু ওষুধপত্তর কবোগে। কোনো কারণে মাথাটা তোমার গরম হযে গেছে।

—হায় ভগবান ! আমি কি করে বিশ্বাস করাই এঁকে ! ···গৌরাঙ্গ সহসা ব্যগ্রভাবে বলে—আমার সাক্ষী আছে হুজুর ! চলুন তার কাছে !

—ও, সাক্ষীটাক্ষী রেখে গুছিয়ে খুন করেছিলে বলো! ··· তু'কড়ি তোমাদের ডাব মজুত নেই?

—আজ্ঞে বিলক্ষণ! এখুনি আনছি, কচি না 'নেওয়া' হুজুর!

—না না, আমায় নয়, আমায় নয়, এঁকে দিতে বলছিলাম—অর্থাৎ এও এক প্রকার উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গ।

গৌরাঙ্গ এবার বিরক্ত হয়েছে। ও ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে—ডাব খাইয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে না, আমি পাগল নই! জানি জানি···দারোগাদের বাহাদুরী জানতে কারো বাকী নেই! নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোলেই হলো, দশটা খুন হয়ে গেলেই বা হিসেব রাখছে কে!

—চোপরাও! খবরদার!

জ্যান্ত বাঘ গর্জ্জন করে ওঠে।

—ওঃ খবরদার! ভয়টা কিসের মশাই, ভয়টা কিসের? ফাঁসির বাড়া তো শাস্তি নেই, যে লোক সেইটাই চায়, তাকে আবার ভয় খাওয়াবেন কিসে? চলুন না ইষ্টিশনমাষ্টার মশাইয়ের কাছে, ভজিয়ে দিচ্ছি—খুন করেছি কি না, মাষ্টারমশাই সাক্ষী আছেন।

তু'কড়ি এক পায়ে খাড়া, চটপটে সুরে বলে—আনবো হুজুর তলব দিয়ে?

—কাকে?

—ইষ্টিশান মাষ্টারকে?

—ডিউটিতে আছে না?

—ডিউটি! ··· তু'কড়ি তাচ্ছিল্যভরে বলে—বুড়োর কাজের মধ্যে তো ঝিমুনি! মাঝে মাঝে একটা ছোটো ছেলের হাত ধরে বেড়াতে যেতে দেখি।

তু'কড়ির বাড়ী ষ্টেশনের ধারে।

ছোট ছেলে!

গৌরাঙ্গর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে···নিশ্চয় বাদল ! হা ঈশ্বর ! কী ভুল করলো সে, একবার ওদের দেখে এলোনা কেন, দূর থেকে চুপি চুপি। ···মাষ্টারদাকে বলে এলোনা কেন, মাষ্টারদা তোমার অনুরোধ রাখা হলো না, আমায় ক্ষমা করো !

এমন করে বেঁচে থাকা অসম্ভব ! এ বাঁচার মূল্য কানাকড়িও নয় ! কিন্তু কি বোকামীই করেছে সে, একবার কেন ওদের দেখে এলোনা। ···কে জানে কোথা দিয়েই বা এসেছে, সোজাসুজি ট্রেনের পথে তো নয়। এসেছে কোন গ্রামান্তর থেকে হাঁটতে হাঁটতে, মাঠ জঙ্গল পার হয়ে খানাখন্দ ডিঙিয়ে। পথ চলতি যাকে পেয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছে—বাসুলডাঙা ফাঁড়িটা কোন দিকে বলতে পারো ভাই, বাসুলডাঙা ফাঁড়ি !

গোবর্দ্ধন গড়াই ভাবেন···ভালো বিপদে ফেললোতো। কে জানে সত্যিই কোন চুলোয় কিছু করে এসেছে কি না, মাথাটা তা'তেই বিগড়ে গেছে। দু'কড়ি বেটা যে আবার সাক্ষী রয়েছে, এ কেসকে একেবারে অবহেলা করলে টুক্ করে ওপরওলাদের কানে তুলবে। ব্যাটা ঘুঘু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার বদভ্যাস ওর বরাবরের।

তারপর যদি কোথাও কোনো ঘটনা আবিষ্কার হয়ে পড়ে ! তখন? নিদেন পক্ষে পাগলের উপরও তো একটা দায়িত্ব আছে, সরকারী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ?

অগত্যাই গোবদ্ধন গড়াই এক চোখ মুদে হুকুম দেন—যা ধরে নিয়ে আয় ইষ্টিশান মাষ্টারকে।

—আজ্ঞে কি বলে ডাক দেবো হুজুর।

—বলবি সাক্ষী হতে হবে, দারোগা বাবুর হুকুম !

ভালোমানুষ ষ্টেশনমাষ্টার মশাই বিব্রত ভাবে বলেন—ইষ্টিশান ছেড়ে যাবার হুকুম তো নেই ভাই, এখন ডিউটিতে রয়েছি।

দু'কড়ি পা ঠুকে বলে—দারোগাবাবুর হুকুম। যেতেই হবে মাষ্টারমশাই!

—বেশ!

মাষ্টার মশাই নিজস্ব ছাতাটি নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকেন।

—পা চালিয়ে আসেন না মশাই—দু'কড়ি হাঁকে।

—যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলোতো হে দু'কড়ি? সাক্ষী কিসের, বুঝতে তো পারছিনে।

—বুঝতে আর হবে না মাষ্টারমশাই—দু'কড়ি বলে—এক পাগলের পাল্লায় পড়ে দারোগাবাবু এখন বুঝলেন কি না নাজেহাল। ব্যাটা এসে বলে কি না—'আমি খুন করেছি আমায় ফাঁসি দাও'!

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন মাষ্টারমশাই, বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে বললেন—এই কথা বলেছে? —কি রকম লোক?

—পাগলা পাগলা লোক আর কি, পা চালান মাষ্টারমশাই, আমাদের দারোগা বাবুটি তো আবার তেমনি কি না, দু'ঘা লাগিযে দিয়ে ভাগিযে দে, তা' নয়— তা'র আদ্যোপান্ত বিবরণ শোনো বসে বসে। 'তিনি খুন করেছেন—ইষ্টিশান মাষ্টার মশাই সাক্ষী আছেন—এই সব বিত্তান্ত।··· আবার খুন করেছেন. কা'কে, না শশধর ঘোষালকে, যে লোক দু'বেলা কাছারি ঘর করছে···ওকি অমন করছেন কেন আজ্ঞে?

—অমন করছি কেন! অমন করছি কেন! না না কিছু করিনি তো ভাই, কিছু করিনি তো! ···চলো চলো কোথায় যেতে হবে নিয়ে চলো ভাই দু'কড়ি!

মধ্যরাত্রির অন্ধকারে রক্তাক্ত শশধর আর তার ক্রন্দনাকুল মাতা ভগিনীর মুখের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে যে ঘরখানা থেকে বিদায় নেওয়া হয়েছিলো, আবার সে ঘরের যবনিকা উঠতে দেখা গেলো বৈশাখের এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে।

বাগানের দিকের সেই অভিশপ্ত দরজাটা রয়েছে খোলা, খোলা দরজা দিয়ে বৈশাখী বিকেলের এলোমেলো হাওয়া ঘরের সব জিনিষকে যেন চঞ্চল করে তুলছে।

দরজার কাছটায় চুপ করে বসেছিলো শশধর, একটা বাতাস-কম্পিত ঝিরঝিরে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে।

দীর্ঘ দু'টি মাস বিছানায় পড়েছিলো শশধর, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে তার এই ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে—বাসন্তী যখন অন্যত্র থেকেছে, থেকেছে রান্নাঘরে, পুকুর ঘাটে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে শশধর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে একটুকরো আকাশ, আর এই গাছটাকে।

তখন কিন্তু গাছটার না ছিলো এমন ঐশ্বর্য্য, না ছিলো এতো রূপ! পাতাগুলো গিয়েছিলো নিশ্চিহ্ন হয়ে, আর সেই পাতাঝরা ন্যাড়া ডালগুলো যেন আকাশের দিকে বাহু মেলে অহরহ কার কাছে কি ভিক্ষা জানাতো।

কি সেই ভিক্ষা ?

সে কি এই প্রাণরস ? যে রস সমস্ত রিক্ততাকে পূর্ণ করে তোলে, নিমের তিক্ততাকেও দেয় লোভনীয় আস্বাদন। ··· ওই যে ওর সিল্কের মতো হাল্‌কা ঝিরঝিরে পাতাগুলির অবিরাম নৃত্য, ওই যে পীত হরিতের উজ্জ্বল সমারোহ, এ সব কোথায় ছিলো ? কে জোগায় এই প্রাণরস ? মৃত বিবর্ণ ডালগুলোয় কে আনে নতুন জীবনের স্পন্দন !

ঘরে বাইরে সবাই বলে শশধর যে অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরেছে, সে ওর 'পুনর্জন্ম'। চোটটা তো কম লাগেনি। ধারালো অস্ত্রটা হাত থেকে খসে মাটিতে না পড়ে, পড়েছিলো ওর নিজের কাঁধে।

কতোদিন যে ওকে জ্ঞান চৈতন্যের বাইরে থাকতে হয়েছিলো, তা' ঠিক মনে নেই, কিন্তু এইটা মনে আছে প্রথম যখন জ্ঞান হলো, তখন মনটা 'ছি ছি' করে উঠেছিলো নিজেরই উপর।

আশ্চর্য্য ! ঘৃণা আসেনি বাসন্তীর প্রতি, হিংস্র ক্রোধ আসেনি হতভাগ্য পলাতকটার প্রতি। লজ্জায় অনুশোচনায় মনটা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আর সেই স্তব্ধতার অন্তরালে একটানা একটা ধ্বনি অনুচ্চারিত উচ্চারণে বলে চলেছিলো 'ছি ছি'।

পুনর্জন্ম, না নবজন্ম !

নইলে শশধরের এতো চিন্তাশক্তি হলো কি করে ? এমন গভীর হয়ে গেলো কেমন করে সে ? ··· বিছানায় পড়ে পড়ে শুধু ভেবে ভেবে ? না কি জানলার মধ্য দিয়ে অবিরাম যে একখানি প্রসন্ন দৃষ্টি ওর মুখের পানে চেয়ে

থাকতো, সেই এক টুকরো আকাশ, সে কি ওর মনের দরজায় পৌছে দিয়ে গেছে উদারতার বার্তা ?

বিছানায় পড়ে শশধর নতুন করে দেখেছে বাসন্তীকে, বুঝি বা নতুন করে পেয়েছে।

চোখ খুললেই চোখে পড়েছে একখানি বেদনাহত উদ্বিগ্ন মুখ, দেখেছে সে মুখের অধিকারিণীর নিরলস সেবা। ··· সে মুখ যেন দেবীর মুখ, সে সেবা যেন তার হৃদয়ের অর্ঘ্য।

না, আর ভুল করবে না শশধর।

শশধর আর বাসন্তী—এরা আর ওরা—এই সব অল্প শিক্ষিত আর অশিক্ষিত অগণিত নরনারীর দল, এদের জীবনে অসংখ্য ঘাটতি, এদের বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, মার্জ্জিত ভাষায় মনের কথা ব্যক্ত করবার শিক্ষা নেই, সুচারুভাবে আপন হৃদয়রহস্যকে বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু বিধাতার দেওয়া একটি সম্পদ থেকে ওরা বঞ্চিত নয়। অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে দীন নয় ওরা। ···

সেই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে হয়তো পারে না, হয়তো প্রকাশ ভঙ্গীটা দুর্ব্বল আর শিক্ষিত সমাজের কাছে হাস্যকর, তবু ওদের জীবনে তার মূল্য কম নয়। ··· ওরা যখন ভাবে, তখন নিজের ধরনেই ভাবে সত্যি, কিন্তু তার আলোড়নটা তো কম হয় না। যখন ডুবে যায় গভীরে, যখন মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখন ওদেরও ভালো লাগে বৈশাখের অপরাহ্ণ বেলায় পীতে হরিতে মেশানো নতুন পাতাধরা নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, উদাস হয়ে যেতে ভালো লাগে সেই সিল্কের মতো চিকণ পাতাগুলির অবিরাম ঝিরঝিরানি দেখতে।

আজ বুঝি বৈশাখী পূর্ণিমা।

ঠাকুরবাড়ীতে আজ সত্যনারায়ণ আছে, অনেক দিনের পর আজ ঠাকুরবাড়ী গেছেন নিভাননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বোধকরি তার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন কামনা মানত করাতে।

'কলাবতীর' উপাখ্যানের সঙ্গে যদি সুধার ভাগ্যের কিছু মিল হয়। ··· জামাইকে নিভাননী দেখতে পারতেন না সত্যি, কিন্তু তার দ্বারা যে একটা কুৎসিত কাজ সম্ভব নয়, এ জ্ঞান নিভাননীর ছিলো।

পরস্ত্রীকে ঘরের বার করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনাটা যে তার বাদলের পরিকল্পনার চাইতে কিছু ঘোরালো নয়, এও তিনি বুঝেছিলেন। শশধরের একটা ফাঁড়া ছিলো এই ধরেছেন নিভাননী।

কিন্তু এখন ভাবনা সে হতভাগা ছোঁড়া পালিয়ে গিয়ে আত্মঘাতী হলো কি না! নিজের মেয়ের সে সর্ব্বনাশের চিন্তায় নিভাননী নিতান্তই মুসড়ে গেছেন। তাই সুধাকে উপবাস করিয়ে তাকে নিয়ে গেছেন দেবদুয়ারে মানত করাতে।

বাদলটাকে তো একবার সঙ্গে নেবার জো নেই, বিকেল হলেই ইষ্টিশান যাওয়া চাই তার। ··· বাড়ীতে কোনো কথা ব্যক্ত করে না বাদল, তবু বাড়ীশুদ্ধ সকলেই বোঝে, কিসের দুরাশায় অবোধ ছেলেটা প্রত্যহ একই জায়গায় ছুটে যায়। ··· আর কোন্ হতাশায় ম্লান মুখে ফিরে এসে কোনো কথা না বলে বই নিয়ে পড়তে বসে।

বাদলের দুঃখ দেখে মাঝে মাঝে কঠোর হৃদয়া নিভাননীরও বুক ফাটে।

ব্যস্ত হাতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম সেরে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকলো। একটু চুপ করে শশধরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করলো—অমন উদাস হয়ে কি ভাবছো গো ?

শশধর চমকে তাকালো, বাসন্তীর আসা ও টের পায়নি। তারপর বললো—ভাবছি সেই হতভাগাটার কথা, যে খেয়ালী, হয়তো কোথাও জলেই ঝাঁপ দিয়েছে।

—দুর্গা দুর্গা !

বাসন্তী ম্লানভাবে বলে—ও কথা বোলোনা গো।

—সাধে কি বলছি বাসন্তী, আজ এই ছ'মাসে কোনো খবরও তো পাওযা গেলো না ছোঁড়ার। কলকাতার তিন তিনটে কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিলাম।

বাসন্তী একটুখানি স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে—সে কি আর ও সব কাগজ-পত্তর পড়ে ?

—পড়ে না, তাতো জানি বাসন্তী, কিন্তু ও ছাড়া খোঁজবার আর তো কোনো উপায়ও জানি না। ·· এতোবড়ো পৃথিবীতে কেউ হাবিয়ে গেলে কি খুঁজে বার করা যায়, যদি সে নিজে ইচ্ছে করে এসে ধরা না দেয়।

—আমার মন বলে 'নিশ্চয় আসবে'। একদিন না একদিন নিশ্চয় আসবে।

অকপটে আপন হৃদয়বিশ্বাস ব্যক্ত করতে দ্বিধা করে না বাসন্তী। ··· সে জানে শশধবেব দ্বিধা আব সংশয ঘুচেছে।

নাঃ সত্যিই আর দ্বিধা নেই শশধরের।

নিজের মনের সেই কুৎসিত সন্দেহের গ্লানিকর ইতিহাস স্মরণ করলে

এখন ওর যেন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। ··· সেই ভয়াবহ রাত্রে সত্যিই সে জ্ঞান হারিয়েছিলো। গৌরাঙ্গকে রান্নাঘরের দরজায় বসে চুপি চুপি কথা কইতে দেখেই ওর মনের মধ্যেকার গুটিয়ে থাকা সাপটা উঠেছিলো ফণা তুলে, আর পিছন থেকে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যখন শুনেছিলো বাড়ী থেকে পালানোর পরিকল্পনা, তখন রইলো না কোনো বোধ, হারিয়ে ফেললো হিতাহিত জ্ঞান।

এতোবড় একটা ঘোরালো পরামর্শের কারণটা যে এমন হাস্যকর একথা কে বুঝতে পারবে! কিন্তু সেই প্রসঙ্গে বাসন্তী একদিন জোর দিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলো—বোঝা উচিত ছিলো! দশ বছর ধরে দেখছোনা তুমি ওকে? দেবতা আর জানোয়ারে তফাৎ ধরতে পারো না? ···বলেছিলো—সংসারের কোনো জ্ঞান ওর আছে দেখেছো কোনোদিন? স্বার্থবুদ্ধি আছে এক ফোঁটা? মানুষকে খামোকা সন্দেহ করলেই হলো? সন্দেহটা কি ছোটো কথা? শুধুই ওকে সন্দেহ করোনি, আমায় সন্দেহ করেছো তুমি, কেন না পরিবার হলো মুঠোর জিনিশ, মারো কাটো কেউ কিছু বলবে না। তাকে সন্দেহ করলে ফাঁসির দায়ে পড়তে হবে না, তাই ফট্ করে অমনি করে বসলে সন্দেহ, বলে বসলে সে কথা! ···যে অপমানের কথা, অপর একটা মেয়েমানুষের নামে বলে ফেললে মানহানির দায়ে ঘানি টানতে হয়, সে কথা অনায়াসে বলে বসো তোমরা পরিবার কেনা বাঁদী বলে কেমন?

সেই আহত অভিমানে আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে শশধর যেন মরমে মরে গিয়েছিলো, নিজেকে তখন বড়ো ক্ষুদ্র মনে হয়েছিলো তার, বাসন্তী যে আর কাউকে ভালোবাসবে, এ চিন্তাই তার এমন অসহ্য যে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।

বাসন্তী সতেজে বলেছে—'ভালোবাসি তার কি? বাদলাকে ভালোবাসি না আমি? ···ভালোবাসা মানেই কি খারাপ? ···বন্ধুত্ব থাকতে পারে না দুটো মানুষে? একটা মানুষের ওপর আর একটা মানুষের 'ছেদ্দা ভক্তি' থাকতে পারে না?···বিয়ে হয়ে এসে পর্য্যন্ত দেখেছি তোমাদের বাড়ীতে মানুষ গুলো যেন কাজ করার যন্তর, হাসি নেই কথা নেই গান নেই, প্রাণ আমার হাঁপিয়ে আসে। ···ওই একটাই মানুষ দেখলাম যার প্রাণ আছে। তাই তো ওকে আমার ভালো লাগে, তাই বলে তার মানেই আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে যাবার মতলব ভাঁজবো? বুদ্ধি বটে একখানা! ···একটা মানুষের সঙ্গে হেসে দু'টো কথা বললেই যদি মেয়ে মানুষের সতীত্ব চলে যায়, তবে নাই বা থাকলো অমন ঠুনকো জিনিষ! সে জিনিষের মূল্যই বা কি? ···আর তোমারই বা কেমন ভালোবাসা, যে একফোঁটা বিশ্বাস রাখতে জানো না? মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাসই পুষে রাখলে তো, সে বৌকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখার কোনো মানে আছে? নিজের ওপর অপমান আসে না তা'তে? ঘেন্না করেনা সে বৌকে নিযে ঘর করতে? দেহটা তো মাটির ঢেলা, মনে মনে যদি কেউ পরপুরুষকে ভজে, তা'র আর রইলো কি?

বাসন্তী যদি লেখাপড়া জানা সভ্য মেয়ে হতো, ওর এই জোলো জোলো কথাগুলো একটা জোরালো বক্তৃতা হয়ে উঠতে পারতো, তা হয় নি। তবু ওর বক্তব্য ও বুঝিয়েছে বৈ কি। ·· ওর চাইতে মার্জ্জিত ভঙ্গীতে প্রকাশ করলে শশধরই কি বুঝতে পারতো?

অহরহ সেবা আর সাহচর্য্যের মধ্যে অনেক অবসর পেয়েছিলো বাসন্তী, বলে নিয়েছিলো অনেক কথা। বলেছিলো—এই যে তুমি কাছারী বাড়ীতে

বাবুদের কাজ করো, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাসী হয়ে, ওরা যদি খামোকা তোমাকে চোর অপবাদ দিয়ে বসে, বলে 'নায়েব মশাই আমাদের ত'বিল তছ্রূপ করেছে,' মনে কেমন লাগে বলোতো ? ···মনের ঘেন্নায় আমিতো আত্মঘাতী হবার সংকল্পই করেছিলাম, শুধু তোমার এই অবস্থার জন্যেই সব ভুলতে হলো।

শশধর ওর হাত ধরে কাতরভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলো, বলেছিলো— 'আমি অন্ধ ছিলাম বাসন্তী, কোনোদিন তোমায় বুঝতে পারিনি।'

বাসন্তী বললে—তোমাদের ইষ্টিশানমাষ্টার ও হয়েছে আচ্ছা এক পাগল, রোজ এই ডনডনে রোদ্দুরে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে রেলগাড়ী আসা দেখানো চাই !

—বাদলা ফেরেনি এখনো না ?

—এই এলো, আমি ওকে বলে কয়ে ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম—'সেখানে মা আছে, দিদিমা আছে, যা বাবা যা, ঘুরে আয়। মায়ের প্রাণটা তবু একটু জুড়োক'—তবে যাব। ···আহা ঠাকুরঝির জন্যে বড়ো মন কেমন করে আমার ! ··· সে জৌলস নেই, সে কোঁদল নেই, সেই পাড়া বেড়ানোয় ঝোঁক নেই। শূন্য প্রাণ খাঁ খাঁ করে, আর বসে বসে একখানা চটের আসনে ফুল তোলে। ···

—আসনে ফুল তোলে ? সুধা ও সব পারে নাকি ?

—পারতো না, শিখে নিয়েছে আমার কাছে। বলে—'ও যদি কখনো আসে, এতে বসবে, আর না যদি আসে, সুধা মরলে সুধার চিতায় দিও।'

বলতে গিয়ে শুধু বাসন্তীরই নয়, শুনতে শশধরেরও দুই চোখ সজল হয়ে আসে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শশধর বলে– বড়ো ভাই হয়ে আমি ওর এয়োতের ওপর খাঁড়া তুলেছিলাম !

—থাক ও সব ভেবে আর মন খারাপ কোরো না। ভগবানের কাছে অষ্টপ্রহর প্রার্থনা করছি 'ঠাকুর, ঘরের মানুষটাকে ঘরে ফিরিয়ে দাও, ঠাকুরঝির প্রাণের জ্বালা দূর হোক, ছেলেটার প্রাণ রক্ষে হোক, আর আমি আমার বন্ধু পেয়ে বাঁচি।'

শশধর করুণ হেসে বলে—আর আমার ভাগে কিছু রাখলে না যে ?

—তোমার ? বাসন্তী একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে—তুমি আবার শুম্ভ নিশুম্ভের পালা বাঁধো !

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ বসে থাকে ··· এক সময় সন্ধ্যা হয়ে আসে, বাসন্তী উঠে পড়ে বলে—যাই তুলসীতলায় সন্ধ্যে দিইগে। ··· শশধর বলে—আমারও আহ্নিকের জোগাড়টা করে দাও। ··· দূর, পুজো পাঠ আর ভালো লাগে না। করলাম তো সেই ন' বছর বয়স থেকে পৈতে হওয়া ইস্তক, কি আর হলো ! মনের গলদই যদি ঘোচাতে না পারলো তো, বৃথাই গুরু আর গায়ত্রী !

শশধর যখন পূজোয় বসেছে, সহসা বাইরে থেকে কেমন একটা হৈ চৈ কানে আসে। উঠোনের ওদিকে বেড়ার দরজাটার কাছ থেকেই যেন গোলমালটা আসছে। ··· গায়ত্রী ধরেছে, উঠতে পারে না শশধর, শুধু জপ স্থগিত রেখে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

অনেকগুলো গলার মধ্যে ও কার গলা ? কে যেন মিনতি করে করে কাকে কি বলছে, আর তার চারপাশে উদ্দাম হয়ে উঠেছে অনেকগুলো কণ্ঠের কলগুঞ্জন ! ··· কি হলো, এই ভরসন্ধ্যায় কেউ চোরটোর ধরলো না কি ? ··· কিন্তু ও কণ্ঠস্বর কার ?

যো সো করে পূজো সেরে শশধর যেই পূজোর ঘর থেকে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই সময় সহসা সত্যআগত বাদলের তীক্ষ্ণ গলা বাঁশীর মতো চীৎকার করে ওঠে—বাবা ! বাবা ! আমার বাবা এসেছে রে !

সঙ্গে সঙ্গে নিভাননীর তীব্র ক্রন্দন—ওরে আমার হারানিধি ফিরে এসেছে রে !··· বৌমা শীগগির যাও, ছুটে গিয়ে পাড়ার একজন এয়োর হাতে পান সুপুরি দিয়ে এস। হতভাগার জন্যে পান সুপুরির ব্রত মেনে রেখেছি আমি।

বিরহ বুঝি এমনি করেই চিত্তকে শুদ্ধ করে তোলে !

হয়তো ভবিষ্যতে আবার নিভাননী জামাইকে গাল পাড়বেন, আবার সশব্দে ঘোষণা করবেন 'অমন জামাই থাকার চেয়ে মেয়ে বিধবা হওয়াও ভালো'···তবু এই ক্ষণটুকু তুচ্ছ নয়, এই ক্ষণটুকুই পরমক্ষণ। অসতর্ক আকস্মিকতার মুহূর্ত্তে মানুষের যে রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই তো আসল।

ইন্‌স্‌পেক্টর গোবর্দ্ধন গড়াইকেও ধরে এনেছেন মাষ্টার মশাই, ছাড়েন নি। পথে জমে যাওয়া পাড়ার লোকরা আপাততঃ দরজা থেকে বিদায় নিয়েছে, কারণ সন্দেহ তা'দের ঘোচেনি এখনো। ইন্‌স্‌পেক্টরের আবির্ভাবের সঙ্গে একটা কল্পিত কাহিনী যোগ করে ওরা আপাততঃ গেছে জল্পনা কল্পনা করতে। কে জানে বাবা, যদি কারো সাক্ষ্য চেয়ে বসে !

অবিশ্যি চাইলেই দিয়ে বসবে বাসুলডাঙার লোক এতো বোকা নয়। সে রাত্রে, অর্থাৎ যে রাত্রে না কি ওদের শালা ভগ্নিপতিতে কি নিয়ে বচসা হয়ে একটা রক্তপাত কাণ্ড হয়ে গেলো, সে রাত্রে তখন পাড়াসুদ্ধ লোক যে ঘুমে অচেতন হয়ে ছিলো এ আর কে না জানে !

গড়াইয়ের সঙ্গে শশধরের যথেষ্ট পরিচয় ছিলো, কাজেই তিনি বাদলকে

এবং দু'টি প্রতীক্ষমানা নারীকে অসহিষ্ণুতার শেষ সীমায় এনে তবে বিদায় নিলেন—থালা বোঝাই মিষ্টি উদরসাৎ করে। ...

বাপের বুকের কাছে বসে থাকা বাদল এতোক্ষণে যেন বাবাকে ফিরে পাওয়ার আশ্বস্তির নিশ্বাসটা ফেলে বাঁচলো।

মাষ্টারমশাই বসেই থাকেন, গৌরাঙ্গর সমস্ত ইতিবৃত্ত না শুনে নড়বেন এ ভরসা কম। উৎকণ্ঠিত দু'টি নারীহৃদয়ও যে উৎসুক হয়ে রয়েছে তাকে একান্ত করে পাবার আশায়, সে খেয়াল মাষ্টারমশাইয়ের নেই।

সুধা ভাবে, বাবাঃ বুড়ো দেখছি আজ আর নড়বে না। কাজ কর্ম্ম নেই না কি ওর? এসে যখন পড়েছে, তখন জানবিই তো সব। কালই তো ছুটবে তোর আড্ডায়। বাড়ীর মানুষকে বাড়ীর লোকের সঙ্গে সুস্থ হয়ে দু'টো কথা কইতে দে। ...

স্বামী যখন আসেনি, যখন ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা ছিলো মনের মধ্যে—হয় তো বা সে নেই, তখন মনে ভেবেছে—যদি ভগবানের দয়া হয়, যদি সে ফিরে আসে, তখন কোনো লজ্জার বাধা মানবে না, ছুটে গিয়ে পায়ে পড়বে, বলবে 'আমায় মাপ করো'।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখছে কই কিছুই তো পারা যায় না। নবোঢ়াবধূ বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীর আশে পাশে যেমন ঘুরতে থাকে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে তেমনি একটা বাড়তি লজ্জাতে ঘোমটাই দিতে হচ্ছে বরং।

হয়তো অপেক্ষা করতে হ'বে সেই রাত পর্যন্তই।

বাসন্তী ভাবছে এ কি হলো! আকস্মিকতার রোমাঞ্চ যে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে! কিছুই কথা হলো না, হলো না তিরস্কার করা।

তবু মাষ্টারমশাইয়ের ভালোবাসার মর্ম্ম বুঝতে পারে বাসন্তী, বুঝতে পারে তাঁর হৃদয়াবেগের আকুলতা। তাই সেও অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে দেখতে থাকে—আহা কী চেহারাই হয়েছে লোকটার! সেই চাঁপাফুলের মতো রং যেন তামামূর্ত্তি হয়ে গেছে।

এখন আর শশধরের মিথ্যা সন্দেহ প্রবৃত্তিকে দোষ দিতে পারছে না, ভাবছে সব দোষ তারই নিজের।

বাসন্তী যদি অমন ছেলেমানুষী না করতো, তা' হলে তো এসবের কিছুই হতো না। ভগবান সব ঠিক করে দিলেন তাই! ···যদি শশধরের কিছু হতো! যদি গৌরাঙ্গ আত্মহত্যা করে বসতো!

শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে থাকে বাসন্তী।

এক সময় ভাবতে থাকে···অনেক দিনের অনেক উৎকণ্ঠার শেষ হলো, সুধা তার স্বামীকে পেলো, বাদল পেলো তার বাপকে · শুধু এই ভেবেই কি এমন আনন্দের জোয়ার এলো প্রাণে?

না, নিজের দিক থেকেও যে রয়েছে অনেকখানি লাভের হিসেব।

তবু নিজেকে সে ধিক্কার দেয় না, আপন হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ দেখে শিউরে ওঠে না, আতঙ্কিত হয় না। বাসন্তীর সাহস আছে।

পুরুষের বন্ধুত্বকে স্বীকার করে নেবার মতো জোরালো সাহস।

নারী পুরুষে বন্ধুত্ব হওয়া কি সত্যই অসম্ভব? এমন মেয়ে কি থাকতে পারে না, যারা মেয়েমনের নিতান্ত মেয়েলি গল্পের মধ্যে না পায় মনের খোরাক, না পায় বৈচিত্রের স্বাদ, মেয়েলি মেয়ে যাদের অসহ্য লাগে।

তারা কি তাদের বন্ধুত্বের ক্ষুধা মেটাতে অন্য জগতের দিকে তাকিয়ে দেখবে না? সেখানে যদি এমন কাউকে পায় যার সঙ্গে চিত্তবৃত্তির মিল আছে, তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেই রসাতলে যাবে সতীধর্ম্ম? যে ধর্ম্ম সহজাত সেই তো সতী ধর্ম্ম। তা'র জন্যে তো চেষ্টা করতে হয় না।

পুরুষ ক'টির মধ্যে কিন্তু অসহিষ্ণুতার বালাই নেই। শশধর যে বেঁচে আছে, এই কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেছে গৌরাঙ্গ, এ যেন গৌরাঙ্গর প্রতি শশধরের অশেষ দয়া, আর একান্ত স্নেহের নিদর্শন!

শশধরও কৃতজ্ঞ বৈ কি। কোনোদিন যদি ও আর ফিরে না আসতো! বাদলকে চুপি চুপি বাপের সঙ্গে কথা বলতে দেখে শশধর সহাস্যে বলে—কি অতো গোপন কথা হচ্ছেরে বাদল? বাবার কাছে খুব কসে মামার নিন্দে করছিস বুঝি?

বাদল লজ্জায় বাপের পিঠের দিকে মুখটা নিয়ে যায়। গৌরাঙ্গ সকৌতুকে বলে না, ও বলছে যাত্রা পার্টি খুলতে আর বিলম্ব কেন? আজ রাত্রেই খুলে ফেললে ক্ষতি কি? ··· ওরে ব্যস চিমটি কাটে যে! ··· আহা বাদল বলছে গানের জন্য আর ভাবনা নেই, বাবুদের বাড়ীর কলের গান শুনে শুনে ও নাকি তিন তিনটে গান শিখে ফেলেছে।

— বলেছে মিথ্যে নয়, আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তি ছেলেটার—শশধর বলে—ক'দিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা' বাড়ীর ভেতর থেকে ওকে ডেকে নিয়ে যেতো। সেইখানে কলের গান শুনে শুনে ক'টা যে শিখেছে, গায় ওর মামীর কাছে। সেই গানটা সেই বাবাকে শুনিয়ে দে না বাদল—বাসন্তীর দিকে একটা কটাক্ষ করে মৃদু হেসে কথাটা শেষ করে শশধর—সেই যে 'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিললো ঘরে, রাধিকার অন্তরে উল্লাস!'

সে কটাক্ষ বাসন্তী ফিরিয়ে দেয় ভাইবোন দু'জনের চোখের উপর।

শশধর সহাস্যে বলে—আপনাদের 'বৃষকেতুর' অভিনয়টা আমার ওপর দিয়েই কতকটা হয়ে গেলো, কি বলেন মাষ্টারমশাই? ···তাই না রে

বাদল ? কাটা পড়ে জোড়া লাগলাম। এতোক্ষণে কথঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়েছেন নিভাননী, তাই জামাইকে অবহিত করতেই বোধ করি উর্দ্ধনেত্রে বলেন—সে কথা মিথ্যা নয় !···বাঁচার আশা আর কিছুই ছিলোনা। নেহাৎ নাকি মা জয়চণ্ডীকে অনেক পূজোর লোভ দেখিয়েছিলাম তাই ছেলেটাকে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। শশধরের আমার এ এক প্রেকার নবজন্ম।

শশধর গৌরাঙ্গর গায়ের ওপর একটু খানি হাতের স্পর্শ রেখে বলে—মা ঠিকই বলেছেন ভাই, ঠিকই বলেছেন, তোর হতভাগা দাদার নবজন্মই ঘটেছে বটে ! নবজন্মই ঘটেছে ! জানোয়ার থেকে মানুষ জন্ম !

অতোবড়ো একটা দাম্ভিক লোকের এমন করুণ স্বীকারোক্তি উপস্থিত সকলকেই অভিভূত না করে পারে না। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বাসন্তীর বড়োবড়ো দুটি চোখে টলটল করে বড়োবড়ো দুটি জলের ফোঁটা, সুধা তো দস্তুর মতো চোখই মুছতে থাকে। ···আর এই নীরবতাকে ভঙ্গ করতেই বোধ করি বাদল বলে ওঠে—ভবঘুরে পার্টি আর হবে না বাবা ! জ্যেঠাবাবু পালার খাতাগুলো সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে !

পুড়িয়ে দিয়েছে !

চমকে মুখ তোলে গৌরাঙ্গ, সচকিত হয়ে তাকায় মাষ্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। সে খাতাগুলি যে তার 'মাষ্টারদার' কী, তা তো আর অজানা নয়।

মাষ্টারমশাই এ চমকানি গায়ে মাখেন না, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে অন্যদিকে তাকিয়ে বলেন—হবে না মানে ? আলবৎ হবে ! দিয়েছি তার কি ? দিয়েছি তার কি ? আবার আমি লিখতে পারি না ভেবেছিস ? ··· সবই তো মুখস্থ আছে আমার, দেখিসনা এবার ভালো খাতায় লিখবো, ভালো খাতায়।

হয়তো স্বপ্নবিলাসী মাষ্টারমশাইয়ের এ আশা সম্পূর্ণ দুরাশাও নয়। হয়তো তাঁর ভস্মীভূত কাহিনীগুলিকে আবার নতুন করে লিখে তুলবেন তিনি ভালো খাতায়।

হয়তো জীবনেও কখনো কখনো কারো কারো ভাগ্যে এমন ঘটে, ভাগ্য-দেবতার অসতর্ক করুণার অবসরে কারো কারো জীবনের ধ্বংসীভূত কাহিনী আবার নতুন করে লেখা হয়, সে লেখা ভালো খাতায় ওঠে।

কিন্তু সে তো দৈবাৎ।

আসলে ভাগ্যদেবতা বড়ো সতর্ক, ফাঁকি দিয়ে কেউ যে জীবনটাকে সহজ করে নেবে, তাঁর সংবিধানে এমন বিধান নেই। সে বিধানের প্রত্যেকটি ধারা আর তা'র প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে বিশদ বুঝিয়ে দেওয়া আছে জীবন কতো জটিল!

তাই একদা অকাল কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে যে হতভাগা লোকটাকে ক্ষুধার অন্নের সামনে থেকে তুলে নিজে হাতে ঠেলে দরজার বার করে দিয়েছিলো অপর্ণা, তা'র জন্যেই জীবন ভোর দুয়ার খুলে রাখতে হবে তা'কে।

অথচ জীবনে কোনোদিন সাহস হবে না তাকে ডাক দেবার!

শুধু অন্ধ একটা আশা মনের মধ্যে মাথা ঠুকে মরে।... আর একবার দেখা হয় না? আবার একদিন পথ তাকে এনে দেয় না? ... আবার নতুন করে লেখা যায় না সে দিনের ইতিহাস?

আর কিছু নয়, একটিবার শুধু বুঝিয়ে দেওয়া—'আমাকে যতো নিষ্ঠুর

ভেবেছিলে, হয়তো ততোটা নিষ্ঠুর আমি নই'। ··· 'চপলতা আমি করেছিলাম, সে নিতান্তই আমার স্বভাব বলে'।

কিন্তু 'দৈব' কি বারবার দেখা দেয় ?

দৈবাৎ কি বারে বারে ঘটে ?

তবু অপর্ণা সময় নেই অসময় নেই যখন তখন পথের দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টি মেলে।

অপর্ণার জীবনেও কি এসেছে নবজন্ম ?···

হয় তো তাই, জন্মান্তর না ঘটলে কখনো স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন ঘটে? তা'র সমস্ত চপলতা আর সমস্ত চটুলতা যে স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।

বনস্পতির ইতিহাস রচিত হয়, রচিত হয় না তৃণগুচ্ছের ইতিহাস। তা'রাও যে একদা প্রখর সূর্য্য-পিপাসায় ধরিত্রীর বক্ষ ভেদ করে মাথা তুলে ওঠে, সে কথা মনে রাখবার দায়িত্ব কে নেবে ?

তাদের সুখ দুঃখ আশা হতাশা সবই যে নেহাৎ ক্ষুদ্র। ·· তবু তাদের সেই ক্ষুদ্র আশা আর ক্ষুদ্র হতাশা ক্ষুদ্র অভাব আর ক্ষুদ্র সমস্যা তাদের কাছে যে অনুভূতি নিয়ে আসে সে কি বনস্পতির মহান্ সুখ আর মহতী হতাশার চাইতে কিছু কম তীব্র ? ওদের ক্ষুদ্র চেতনায় এতোটুকু বাতাসের ঝাপটাই যে দুরন্ত কাল বৈশাখীর আস্বাদ দেয়।

যাদের আশার শেষ সীমা হয় তো বা একটা যাত্রার দল খোলা, যারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার জন্যেও এতো বড়ো পৃথিবীতে একটা বিশাল ক্ষেত্র খুঁজে পায়না, সামান্য একটু ব্যবধানের মধ্যেই ঘুরে মরে, আর হয়তো যাদের—

জীবনের বিয়োগান্ত নাটক পর্য্যবসিত হয় তুচ্ছ একটি মিলনান্তক প্রহসনে, তা'দের ইতিহাস রচিত হলেই বা গ্রাহ্য করবে কে! হয়তো অবহেলার হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেবে।... তবু তেমনি ক'টি অকিঞ্চিতকর মানুষের কয়েকটি দিনের তুচ্ছ ঘাত প্রতিঘাতের কাহিনী রইলো গাঁথা।

আরো একটি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর মানুষের স্বাক্ষর ছিলো এ কাহিনীতে, সে হচ্ছে পাইস হোটেলের রাঁধুনী বামুন। ... কতোদিন হয়ে গেলো, পার হয়ে গেলো গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, তবু আজও সে ভরতপুরে একবার করে হোটেলের পিছনের দরজাটা খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। দেখে — কেউ সেখানে অপেক্ষা করছে কি না ·· মাছের আঁশ, পোড়া-কয়লার ছাই, কুটনোর খোলা, আর যাবতীয় আবর্জ্জনার রাশিকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কি না দুটি অন্নের প্রতীক্ষায়!

পাইস্ হোটেলের কদর্য্য অন্ন, তবু বুঝি তার কাছে সে অন্ন পরমান্ন হয়ে উঠতো মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তার স্পর্শে, অহেতুক ভালোবাসার স্পর্শে।

